এখন ডুয়ার্স

বন্যার মোকাবিলায় এবারও জোড়াতালি?

জন্মদিনে কী পেল আলিপুরদুয়ার?

পাখি বিমানে চড়তে সাহস হয় না স্যার!

বনভূমি নেই তবু বনবিভাগের শীর্ষ দুই পদ এবারও কেন কোচবিহারে?

ডাক্তারবিহীন চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে

১ জুলাই ২০১৬। ১২ টাকা

facebook.com/ekhondooars ফেসবুকে যোগ দিন ও বন্ধুদের invite করুন

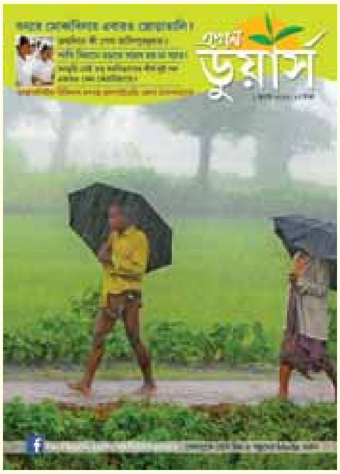

ছিলি তো বেশ ছিপছিপানি কলকলানি জল
আসতে আষাঢ় সর্বনাশী দুরন্ত চঞ্চল
পাড় ভেঙে যায় জলের তোড়ে, জল হয়ে যায় বিষ
ফুঁসছে নদী ডায়না ডিমা তোর্সা নোনাই লিস!

জল ঢুকে যায় গ্রামের ভেতর, ঘর ভাসাল বান
এক নিমেষেই পালটে গেছে সেসব নদীর গান
ভুটান পাহাড় দিচ্ছে ঢেলে তীব্রতর ঢেউ
যেসব নদী আপন ছিল— আজ যেন নয় কেউ!

অরণ্য আজ শিউরে ওঠে উপড়ে পড়ে গাছ
বন্য প্রাণের চোখ জুড়ে ভয়, প্রাণ পেয়েছে মাছ
ট্যাংরা পুঁটি দাঁড়কা ল্যাটা মাছের মহোৎসব
ভিজছে হাতি ভিজছে চিতা বন্য পশু সব!

জল থইথই খেতে এবার বুনতে হবে ধান
পাট জাগানির গন্ধে আবার মজতে থাকে প্রাণ
ত্রাণশিবিরে রাজনীতি নয় সত্যি আসুক ত্রাণ
বানভাসি এই ডুয়ার্স জুড়ে এখন জলের ঘ্রাণ!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- উতংক দে

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১ জুলাই ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪

বানভাসি ডুয়ার্স
নদীর উপর অত্যাচার চলে বছরভর ৮
জোড়াতালির বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রত্যেকবার ১০
থ্রোয়িং বোল্ডার ইন ফ্লোয়িং ওয়াটার ১৩

দূরবিন
শিলিগুড়ি পুরসভার প্রতি রাজ্য সরকারের অনমনীয় ভূমিকার সুযোগ নেবে বিজেপি ১৪

খালি চোখে ডুয়ার্স
ডাক্তারবিহীন আধুনিক চিকিৎসার জন্য ১৬
কোচবিহারের মানুষ চাইছে ১৮

এখন ডুয়ার্স
আলিপুরদুয়ারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ১৯
মন কিন্তু ভরল না আলিপুরদুয়ারের ২০
পাখি বিমানে কলকাতা পাড়ি ২১
বন বিভাগের মূল দুই দায়িত্ব ২২
সংকটে মদনমোহন ২৩
৩৬ কিমি ঝাঁ-চকচকে যে পথে ২৪

উত্তরের উজ্জ্বল মুখ
খেলার মাঠে নিরলস কারিগর গৌতম ২৬

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স ২৮

শিক্ষার ডুয়ার্স ৪৬

পর্যটনের ডুয়ার্স ৪৮

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ১২
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৪০
বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৩
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৫০

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩২
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৪
তরাই উৎরাই ৩৭

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪৪
ভাবনা বাগান ৪৭
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৯
শখের বাগান ৪৯

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/
aaddaghar

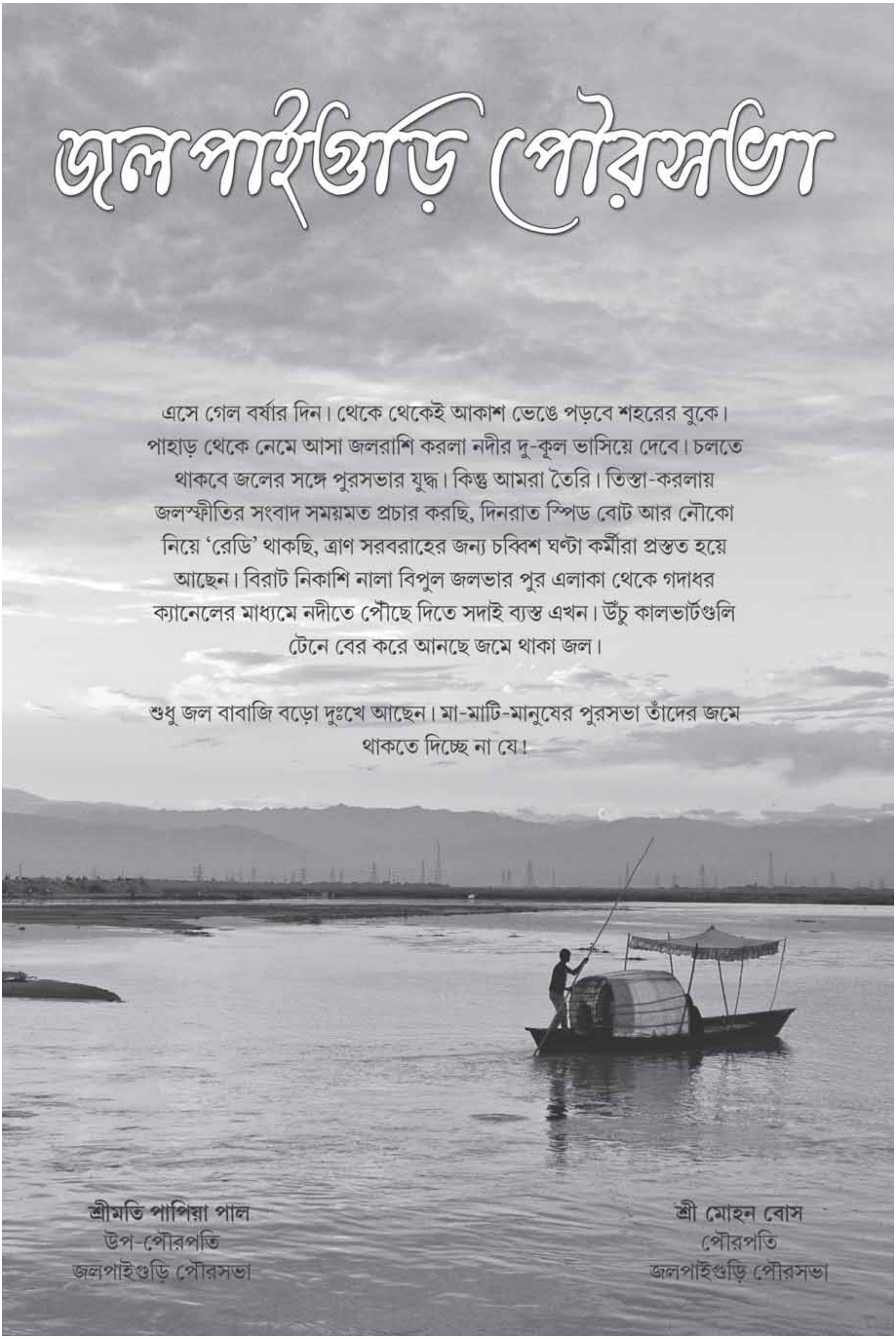
জলপাইগুড়ি পৌরসভা
এসে গেল বর্ষার দিন। থেকে থেকেই আকাশ ভেঙে পড়বে শহরের বুকে। পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশি করলা নদীর দু-কূল ভাসিয়ে দেবে। চলতে থাকবে জলের সঙ্গে পুরসভার যুদ্ধ। কিন্তু আমরা তৈরি। তিস্তা-করলায় জলস্ফীতির সংবাদ সময়মত প্রচার করছি, দিনরাত স্পিড বোট আর নৌকো নিয়ে 'রেডি' থাকছি, ত্রাণ সরবরাহের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা কর্মীরা প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিরাট নিকাশি নালা বিপুল জলভার পুর এলাকা থেকে গদাধর ক্যানেলের মাধ্যমে নদীতে পৌঁছে দিতে সদাই ব্যস্ত এখন। উঁচু কালভার্টগুলি টেনে বের করে আনছে জমে থাকা জল।
শুধু জল বাবাজি বড়ো দুঃখে আছেন। মা-মাটি-মানুষের পুরসভা তাঁদের জমে থাকতে দিচ্ছে না যে!
শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা
শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

মাননীয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে

বলাই বাহুল্য, এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ নেতা আপনিই, দৈর্ঘ্যে তো বটেই, ক্ষমতাতেও আপনি এখন উত্তরের শৃঙ্গে অবস্থান করছেন, কোনও সন্দেহ নাই। আমরা আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলতে পারি, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তো বটেই, গত ৩৪ বছরের বাম জমানাতেও উত্তরবঙ্গ থেকে এত প্রতিপত্তিসম্পন্ন জননেতা তৈরি হয় নাই। উত্তরের মিডিয়াকুল পাতাজোড়া আপনার পূর্ণাঙ্গ দৈর্ঘ্যের ছবি ছাপতে সক্ষম না হলেও আপনার 'এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ' নামক যে সব বস্তু ইতিমধ্যে পরিবেশন করেছেন, পরিতাপের বিষয় হল, তা থেকে আপনার ভাবনা পরিকল্পনা, দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা বা বোঝা যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ক্ষমতার পরিধি বা সীমারেখার জ্ঞান সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের মানুষকে সম্যক অবহিত করা যে সংবাদমাধ্যমের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তা সম্ভবত এঁরা বিস্মৃত হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রথমেই আপনার কাছ থেকে যা জানতে চাইবে বা আশা করবে তা হল উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের কত পরিমাণ কোন জেলার জন্য প্রস্তাব বা পরিকল্পনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিগত পাঁচ বছরে যে সব ক্ষেত্রে সময় বা অর্থের অভাবে কাজ করা বাকি রয়ে গেছে সেগুলিকে এবার অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কি না। তৃতীয়ত, উত্তরের সাতটি জেলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পরিকাঠামো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আপনার কোনও বিশেষ ভাবনা রয়েছে কিনা। এই তিনটির স্পষ্ট উত্তর পেলে সাত জেলার মানুষ অকারণে যেমন বৈষম্যের আওয়াজ তুলতে পারবে না, তেমনই মানুষ ধন্যবাদ জানাবে আপনার স্বচ্ছতাকে।

আপনি ভালো করেই জানেন উত্তরের মাটিতে হাসপাতাল, বিদ্যালয় ছাড়া মাঝারি বা ভারী শিল্পের মতো বেসরকারি উদ্যোগ টানা কঠিন কাজ, সে তুলনায় পর্যটন শিল্পে মনোনিবেশ করাটা অনেক সহজ। সংবাদমাধ্যমগুলির এটুকু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত— কোনও পর্যটন কেন্দ্রে কটেজ তৈরি বা ফুলের গাছ লাগানোর কাজটা পর্যটন দপ্তরের, পরিবহণ দপ্তরের কাজ পর্যটকদের সুলভে সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, কিন্তু তার থেকেও অনেক বড় কাজ সেই পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছাবার জন্য যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া এবং সে কাজটি করে দিতে পারেন আপনিই। দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গে এখনও বহু কাজ করা বাকি এবং প্রথম পাঁচ বছরে তার সূচনা হয়েছে মাত্র। আপনার কার্যকালে সেই কাজের ধারা এক নতুন মাত্রা নেবে সেই আশা করতেই পারে উত্তরের মানুষ। যেমন উত্তরবঙ্গ জুড়ে 'সেতুবন্ধন' প্রকল্প নিয়ে যদি প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন নদীর ওপর মাঝারি-বড় সেতুগুলিকে ধাপে ধাপে করে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া যায় তবে তার ফল হতে পারে অনেক সুদূরপ্রসারী। নিশ্চয় মানবেন, আপনার নিজের কেন্দ্রে দেওচড়াই-বলরামপুর সংযোগকারী সেতুর সুফল আপনি পেয়েছেন হাতেনাতে।

কোচবিহার শহর ও জেলাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে আপনার কর্মযজ্ঞ যে সম্পূর্ণ হতে পারে না তা আলাদা করে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। রাজার শহর কোচবিহারকে জনবিস্ফোরণ ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করার জন্য পাখির চোখে দেখার ক্ষমতা আপনার নিশ্চয়ই আছে। আর সাত জেলা জুড়ে ছুটে বেড়ানোয় সহযোগিতার জন্য আপনার টিমে সামিল করা দরকার প্রত্যেক জেলার সেইসব বিধায়কদের যাঁরা কাজ করতে জানেন। আমরা জানি আগামী পাঁচ বছর আপনার খাওয়া-ঘুম-বিশ্রাম বিপন্ন হবে, আপনি সুস্থ থাকুন।

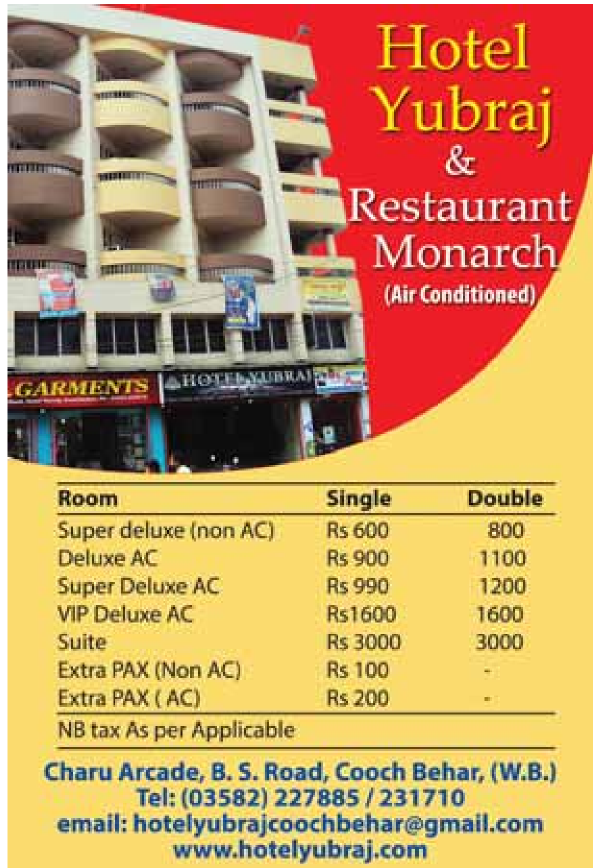

পায়ে পায়ে পুরুলিয়ায় টুসু পরবের দেশ পুরুলিয়া। বছরের ওই সময়ে গোটা জেলা আনন্দে রঙিন হয়ে ওঠে। বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ালে লাগে নতুন রঙের পরত, মানুষের মনেও লাগে উৎসবের ছোঁয়া। ছৌ নাচের ছন্দে মেতে ওঠে পুরুলিয়া। আর কংসাবতী নদীর ধার ঘেঁষে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা লাল পাথুরে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে পুরুলিয়া আপনাকে আপন করে নেবেই।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal (033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

পরিহাস

নিয়মিত পরিহাস! হাতি মারতে মরল মানুষ। আজ্ঞে হ্যাঁ... ফসল বাঁচাতে জমির মধ্যে অনেকেই তড়িৎ ফাঁদ পেতে রাখেন। সেই নিজের ফাঁদে নিজেই জড়ালেন জনৈক কৃষক। খেতের চারদিকে বিদ্যুতের বেড়া লাগিয়ে আশ্চর্য নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ডুয়ার্সে। যে জমিতে বেড়া, সে যে আসলে হাতিদেরই জমি, সে কথা ভুলেই গিয়েছে পাবলিক। হাতিদের কাছেও কোনও দলিল-দস্তাবেজ নেই। তাই হয়ত নিয়তি মাঝে মাঝে মুচকি হেসে ফেলেন!

বুলেটপ্রুফ পর্যটন

নিশানা ঠিক করুন, নয়ত বাঘ মারতে 'ক্যাগ', মানে কাক মেরে বসবেন। এটাই এখন ডুয়ার্সের প্রশিক্ষণহীন বনকর্মীরা লাগাতার করে চলেছে। আরে বাপু, বন্দুক ধরতে না শিখলে তো যুদ্ধ করা যাবে না! তখন ফের হাতি তাড়াতে সাথিকে মারবেন। দেখুন কাণ্ড! এতক্ষণ হেঁয়ালি করে চলেছি, আসলে এভাবেই বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে বনকর্মীদের বন্দুকের গুলি। তার খেসারত দিতে হচ্ছে নিরীহ গ্রামবাসীদের। মাদারিহাটের ঘটনাটা ধরলে গত এক মাসে ডুয়ার্সের বনকর্মীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া গুলিতে ছ'জন আহত হলেন। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! উফ! পর্যটকেরা সাবধানে জঙ্গলে ঘুরবেন, বলা যায় না, এর পর হাতি বেরলে হাতির চেয়ে বন্দুকের গুলি আপনার পক্ষে বেশি চাপের হয়ে দাঁড়াতে পারে। পারলে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে জঙ্গল সাফারি করুন।

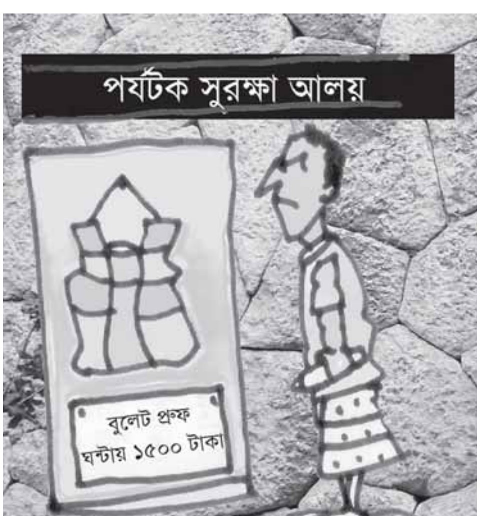

কী আনন্দ!

পর্যটক, আপনাকে বলছি। আপনার আর হয়রানির দরকার নেই। নতুন পর্যটন মন্ত্রী গৌতমবাবু যে সেরকমই আশ্বাস দিয়েছেন। হ্যাঁ, তাহলে আর বলছি কী। এবার থেকে কেউ আর ডুয়ার্স ঘুরতে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরবেন না। 'তিক্ত' বলতে এই যেমন ধরুন টুর অপারেটরের সঙ্গে পর্যটকের সাংঘাতিক বচসা, এনজেপি থেকে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে দর শুনে মূর্ছা যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। পর্যটকরা নাকি সর্বদা গাইড ও বিভিন্ন পর্যটন দপ্তরের খামখেয়ালির কারণে হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এ নিয়ে ঘোরতর জলঘোলা হয়েছে। তবে গৌতমবাবুর উপর আমরা আস্থা রাখতেই পারি। দেখি না কী হয়!

আশা

তুফানগঞ্জের মানসিক হাসপাতাল নাকি ঢেলে সাজানো হবে। শোনা যায় যে, বিশ্বে অচিরেই প্রতি চারজনের একজন মানসিক সমস্যার কমবেশি স্বীকার হতে চলেছে। ডুয়ার্সেও এই সমস্যায় আক্রান্ত লোক অনেক। এই রোগের 'বিশেষজ্ঞ' ডাক্তারদের চেম্বারও দেখা যায় ডুয়ার্সের ইতিউতি। তাঁদের গুটিকয়েককে বাদ দিলে বাকিরা চিকিৎসার নামে স্রেফ ঘুমের ওষুধ লিখে মোটা ভিজিট পকেটে পুরে 'টাউনে' ফিরে যান। তাই তুফানগঞ্জের হাসপাতাল একটা ভাল সন্দেশ বটে। তবে আমরা ঘরপোড়া গোরুর বংশধর কিনা! হাসপাতালেরও যে মানসিক রোগ হয়, সেটা তো দেখেই আসছি। 'হাসপাতালে ডাক্তার ছাড়া সব আছে'— এমনধারা কথা শুনেই তো রোগী পেগলে যায়! তুফানগঞ্জ এর ব্যতিক্রম হলেই মঙ্গল।

হাড়হিমঘর

সিতাইতে হিমঘর চালু হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। সাড়ম্বরে তা উদ্‌বোধন করে গিয়েছিলেন বর্তমানে 'উবউ' মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এলাকার চাষিরা বেজায় খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে, এবার আলু রাখতে তাঁদের বিস্তর সুবিধা হবে। কিন্তু অচিরেই চার কোটি

টাকার হিমঘর আলু উৎপাদক আর ব্যবসায়ীদের হাড় হিম করে দিতে শুরু করে। আলু পচতে শুরু করে হিমঘরের হিমেল পরশে! তারপর থেকে হিমঘর ঝিম মেরে পড়ে আছে। এখনও। এলাকার নতুন বিধায়ক অবশ্যি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। বিরোধীরা মুচকি হেসে বলছেন, আহা! হিমঘর হয়েছে— এটাই বড় কথা! ভিতরে সবজি না রেখে যাত্রাগানের আসর তো বসানো যাবে!

হস্ত্যাচার

হাতি বোধহয় নাগরাকাটা দখলই করে ফেলবে! এতদিন এমনি ঢুকে পড়ত রাত্রিদিনে। কখনও সখনও 'ভালবেসে' ধান, হাঁড়িয়া খেয়ে ভাগলবা। একটু দুষ্টুমিও যে করত না তা নয়। কিঞ্চিৎ ফসল নষ্ট, মানুষকে নিয়ে একটু ফুটবল খেলার চেষ্টা। যাক গে, সেসব বাদ দিন। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা আরও দিন দিন ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে নাগরাকাটায় লোকজনের দেখা মিলবে না আর। নিয়ম করে সে এলাকায় ঢুকে গজবাহিনী মিডডে মিলের চাল, ফসল ইত্যাদি 'তোলা' বাবদ নিয়ে যেত এদ্দিন। এবার আচার ভরতি বয়াম তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে পঞ্চায়তপ্রধান, বিধায়ক ইত্যাদি পদও যে দাবি করবে না, তা বলা যাচ্ছে না। অতএব সাবধানে থাকিস রে ভাই!

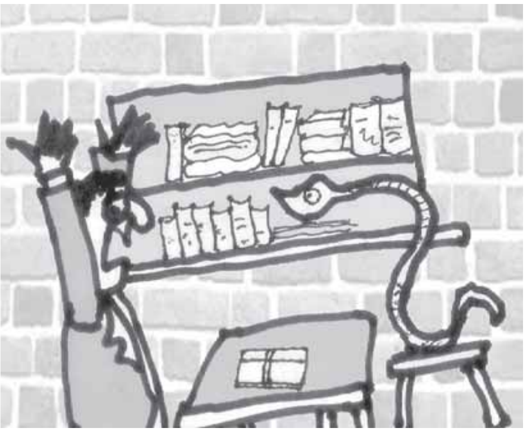

দারুবাথান

গোরুবাথানের বিখ্যাত পিকনিক স্পটে গেলে কী দেখা যায়? ভাবছেন, এটা আবার কেমন প্রশ্ন। পাহাড়, নদী, নয়নাভিরাম প্রকৃতি— এসবই তো দেখার জন্য সেখানে আসেন লোকজন। কিন্তু দাদা! ইদানীং সেখানে গেলেই দেখবেন উক্ত দ্রষ্টব্যের পাশাপাশি রাশি রাশি খালি বোতল। সুরা গলায় ঢেলে বোতল রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়াটা নাকি অভ্যেসে পরিণত করে ফেলেছে ফুর্তি করতে আসা পিকনিক-পর্যটকরা। ফলে নয়নাভিরাম পিকনিক স্পট এখন প্রাকৃতিক ‘ডাস্টবিন’। বাথানে গোরু কম। দারুই বেশি। বলছেন রেগে যাওয়া স্থানীয় মানুষ।

বাপ রে! সাপ রে!

আলিপুরদুয়ারের এসজিএম আদালতের বিচারক থেকে শুরু করে আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী, কর্মী— সক্কলের ঘাম সে দিন ছুটিয়ে ছেড়েছে এক বেয়াদব সর্প। প্রথমে সে নাকি নথি রাখার ঘরে উঁকি দিচ্ছিল। তারপর এজলাসেই চলে আসে হেলতেদুলতে। কেন এসেছিল সে? কাউকে দংশন করে জামিন নিতে? নাকি, পুরনো কোনও মামলার নথি উদ্ধার করতে? রসিক এই আইনজীবীর মতে, মানুষের বিরুদ্ধেই একটা মকদ্দমা ঠুকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাওয়ায় আর নিজে ‘প্রসিড’ না করে সম্ভবত আইনজ্ঞ সাপের খোঁজে ফের জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।

টুকরাণু

বেতন বাড়াও দাবি নিয়ে পাহাড়ে তুলকালাম। কনট্রোল হারিয়ে দুমদাম অ্যাক্সিডেন্ট বেড়েই চলেছে ডুয়ার্সে। তাড়া করে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনের পাশে জমায়েত হওয়া মাতালদের ভাগালেন জলপাইগুড়ির ক্রীড়াপ্রেমীরা। বাগডোগরায় নামত গিয়ে বিমানের চাকা দুম। ডুয়ার্সে বাজারে কার্বাইড পাকানো হলুদ আমের ছড়াছড়ি। শামুকতলায় ‘পিছলা ভূত’ অন্ধকারে মহিলাদের জাপটে ধরে পরমুহূর্তে ভ্যানিশ হচ্ছে। দিনহাটায় একশো বছরের বুড়িমাতার মন্দিরে চোরের হানা। বক্সিরহাট যেতে গেলে গর্তের মধ্যে একটু একটু রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে। ডিমডিমা নদী থেকে বালি-পাথর চুরি করতে করতে তলা দিয়ে যাওয়া তেলের পাইপ বার করে ফেলেছে মাফিয়ারা। বর্ষায় জঙ্গল বন্ধের নিয়ম শিথিল করার জন্য মন্ত্রীর রিকোয়েস্ট, বন দপ্তরের ‘না’। তপসিখাতায় ডুয়ার্সের ভয়াল সাপ কিং কোবরা বা শঙ্খচূড়ের সন্ধান।

হাজার কবিতার ডুয়ার্স

শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে (২৬ জুন, ২০১৬) ‘হাজার কবিতার ডুয়ার্স’ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তার প্রধান কারণ বইটির বিপুল আয়তন, যা আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। শেষ প্রহরে জেগে ওঠার মতো কবিদের পাঠানো কবিতার বন্যায় আমরা, বলতে দ্বিধা নেই, খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ডুয়ার্সের ১২৫ জন কবির মোট এক হাজারের বেশি কবিতা নিয়ে বইটির সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৬৫০ পাতার হার্ডবোর্ড বাঁধাই বইটি আশা করছি জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের হাতে এসে পৌঁছাবে। বইটির দাম ধার্য করা হয়েছে ৫০০ টাকা। কবি-বন্ধুরা অবশ্য প্রথম দু’টি কপি পাবেন একটির দামেই। প্রকাশের দিনক্ষণ ধার্য হলে প্রত্যেক কবিকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হবে।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

নদীর উপর অত্যাচার চলে বছরভর

বর্ষার কালো মেঘ উত্তরের পাহাড় থেকে ডুয়ার্সে নেমে আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। তিস্তা থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ডুয়ার্স ভূমির উত্তর সীমান্তে হিমালয়। কিছুটা দার্জিলিং পাহাড় আর বড় অংশটাই ভুটান পাহাড়ের প্রাচীর। তিস্তা ছাড়া ডুয়ার্সের বাকি নদীগুলি নেমে এসেছে ভুটান পাহাড় থেকেই। তোর্সা, ডায়না, রায়ডাক, জলঢাকা, সংকোশ, কালজানি— এরাই হল ডুয়ার্সের প্রধান নদী। তিস্তা তো আছেই। এদের বাইরেও আছে আরও অনেক ছোট ছোট নদী। পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের উত্তর সীমানায় এই নদীগুলি আচমকা লাফ দিয়েছে চড়াই থেকে উতরাইয়ের পথে।

ডুয়ার্সের রাশভারী নদীগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব অববাহিকা আছে। বৃহত্তর অর্থে ডুয়ার্সের প্রধান নদীগুলি আসলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অংশ। এদের মধ্যে পাঁচটি নদী, অর্থাৎ তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, রায়ডাক আর সংকোশের অববাহিকার বিচার করলে দেখা যাবে, জলঢাকার অববাহিকা সব চাইতে বড়। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এইরকম—

জলঢাকা- অববাহিকার পরিমাণ ৩,৭৪৬ বর্গকিলোমিটার। এতে মিশেছে মুজনাই, সুটুঙ্গা, ডায়না, মূর্তি, ডলং, ধরলা ঘাটিয়া, কুমলাই, দুধিয়া আর গিলান্ডির মতো ছোট নদীগুলি।

তিস্তা- অববাহিকা ৩,৭১৬ বর্গকিলোমিটার। মিশেছে বড় রঙ্গিত, রংপো, রাম্মাম, মেচ, লিস, ঘিস, চেল, মেচি, ন্যাওড়া আর করলা নদী।

তোর্সা- ৩,৪১৯ বর্গকিলোমিটারের অববাহিকা। এই নদীতে জল ঢেলেছে কালজানি, শিলতোর্সা, চরতোর্সা, ডলং, সানঝাই, ঘরঘরিয়া, ডলং, ডায়না, পানা, জয়ন্তি, গারম, বারসা।

রায়ডাক- ৮০৭ বর্গকিলোমিটারের অববাহিকা। মিশেছে রায়ডাক-১ ও রায়ডাক-২ এবং তুরতুরি নদী।

সংকোশ- ১৭২ বর্গকিলোমিটার। চিকলাঝোরা নামের একটাই নদী একে জল জোগায়।

এর বাইরেও আছে আরও অনেক ছোট্ট ছোট্ট নদী। উক্ত নদীগুলি থেকে উৎপন্ন হয়ে তাদেরই কোনও একটায় মিশে গিয়েছে তারা। এরা সবাই জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জেলা পেরিয়ে দক্ষিণে কোচবিহার হয়ে বিদেশযাত্রী। স্মরণাতীতকাল থেকে এই নদীগুলি হিমালয় থেকে বিপুল জলের ভাণ্ডার নিয়ে নেমে আসে বর্ষায়। সে জলরাশি ভূমিঢাল অনুসরণ করে যায় দক্ষিণে বাংলাদেশের দিকে। তারপর ব্রহ্মপুত্রের ধারায় মিশে পদ্মা পাড়ি দিয়ে হারিয়ে যায় সমুদ্রে।

হিমালয় থেকে গভীর অথচ অপ্রশস্ত গিরিখাত বেয়ে নেমে আসা এই নদীগুলি ডুয়ার্সের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকেই চওড়া হতে থাকে। জলের ধাক্কায় নবীন হিমালয়ের শরীর থেকে যা কিছু ভেঙে নিয়ে নেমে আসে তা বোল্ডার, নুড়ি, বালি, পলি প্রভৃতি নামে পরিচিত। অভিকর্ষের নিয়মে এসব জমতে থাকে নদীর তলদেশে। খাত চওড়া হয়। জমতে থাকা অধঃক্ষেপ নদীর ধারাকে বিভক্ত করে দেয়। নদী তখন সরতে থাকে ডাইনে অথবা বাঁয়ে। ডুয়ার্সের ভূখণ্ডে শুভ পদার্পণের পর নদীদের দিক পরিবর্তন তাই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা।

উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে ২০০১ সালে

বোঝা গিয়েছিল যে, তিস্তা আর জলঢাকা পশ্চিম থেকে পুবের দিকে সরে গিয়েছে খানিকটা করে। জলঢাকা সরেছে ২ কিলোমিটারের সামান্য বেশি আর তিস্তা প্রায় ৩ কিলোমিটার। 'শিল' আর 'চর' সমেত তোর্সা নদীও পুবের দিকে মাঝে মাঝেই সরে যাচ্ছে। ডায়না নদী সরছে উলটো দিকে। মানে পশ্চিমের দিকে। উক্ত প্রতিটি নদীর দু'পাড়েই একদা ছিল ঘন অরণ্য। দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অরণ্যরাজি ধ্বংস করা ছিল নদীর প্রিয় খেলা। এখন আমরা জানি যে, তিস্তা বাংলাদেশে ঢুকে মিশে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের অঙ্গে। কিন্তু ১৭৮৭-এর আগেও সে ঝাঁপিয়ে পড়ত পদ্মার কোলে। উক্ত বছরে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের কারণে তিস্তার ধারা এক ধাক্কায় পুব দিকে অনেকটা সরে যাওয়ায় এখন সে ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। ১৯৬৮-র ভয়াবহ বন্যার পর জানা গিয়েছিল, মালবাজার ব্লকের আওতায় থাকা আপেলচাঁদের ফরেস্টের একটা বড় অংশ ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে তিস্তা।

হাসিমারা এলাকায় সুহাসিনী চা-বাগানের কাছে তোর্সা ভাগ হয়ে গিয়েছে তার নদীখাত ভরে যাওয়ার কারণে। দুই ধারা শিলতোর্সা নামে এখন প্রসিদ্ধ। ১৯৫০-এর ভয়াবহ বন্যায় শিলতোর্সা চওড়ায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। চার বছর পর আরেকটি বন্যায় চরতোর্সা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৫৪-এর বন্যায় জলঢাকা পশ্চিমে সরে গিয়ে তন্দু বনাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক উড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৯০ সালেও সে নদী আবার বাঁ তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসায়।

ডুয়ার্স ও তার উত্তর সীমানা বরাবর পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে ডুয়ার্সে চব্বিশ ঘণ্টায় দশ থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার জল ঝরার ঘটনা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুতরাং বর্ষা এলে ডুয়ার্সের নদীর দুই পাড়ে ভাঙন এবং বন্যা স্বাভাবিক বিষয়। প্রতিটি নদীখাতের উচ্চতা প্রতিদিনই বাড়ছে। তিস্তাপারের শহর জলপাইগুড়ি আসলে নদীখাতের তুলনায় কয়েক ফুট নিচে। উঁচু বাঁধ দিয়ে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে দ্বিমত নেই যে, জলপাইগুড়ি আর আলিপুরদুয়ার শহর যে কোনও দিন প্রবল বন্যায় ভেসে যেতে পারে। ডুয়ার্সের নদীতীরস্থ যে কোনও জায়গার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি।

এবারও বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হতে শুরু করেছে। ছোটখাটো সেতু উড়িয়ে খেল দেখাতে শুরু করেছে নদীগুলি। নদীখাত উপচে জল ঢুকে যাচ্ছে লোকালয়ে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর নিয়মিত জল মাপছে, খবর রাখছে। নদীর জল মেপে জারি করছে হলুদ অথবা লাল সংকেত। বোল্ডার আর তারের জাল দিয়ে ভাঙন আটকানোর চেষ্টায় তৎপর হচ্ছে। কিন্তু বর্ষার তিন মাস বাদ দিলে বাকি ন'মাস ডুয়ার্সের নদীগুলিকে যেভাবে ধর্ষণ করা হয়, যেভাবে জোচ্চোরের দল বালি-পাথর তুলে নিয়ে প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেটা তো আর থামবে না। নদীর চর দখল তো চলতেই থাকবে। নদীর মধ্যেই গ্রাম বানিয়ে বসবাসের আশ্চর্য খেলা তো দেখতেই থাকবে ডুয়ার্সবাসী! ডুয়ার্স মানে যে গাছ আর নদী চুরির লীলাক্ষেত্র।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

ছবি: অমিতেশ চন্দ

জোড়াতালির বন্যা নিয়ন্ত্রণ চলে প্রত্যেকবার

মহানগর থেকে বারবার ছুটে যাই উত্তরের প্রকৃতি ঘেরা হিমালয়ের কোল-ঘেঁষা ডুয়ার্সের নানা জায়গায়। দার্জিলিং মেল কিংবা তিস্তা তোর্সা, উত্তরবঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস যখন নিউ জলপাইগুড়ি ঢোকার মুখে রাঙাপানি স্টেশন ছাড়িয়ে মহানন্দা ব্রিজ পার হয়, তখন জানলার ধারে বসে বাঁ দিকে তাকালেই চোখে পড়ে দার্জিলিং হিমালয়ের শোভা। তারপর যখন ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছেড়ে রওনা দেয়, তখন বাঁ দিকে মহানন্দা বালাসন পেরিয়ে তিস্তা-সেবক পাহাড় হয়ে লিস, ঘিস, মাল, চেল, মূর্তি, জলঢাকা, গদাধর থেকে শুরু করে তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক ও সংকোশ কামাখ্যাগুড়ি, কুমারগ্রাম পর্যন্ত প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে। অপর দিকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছেড়ে ডান দিকে আমবাড়ি-বেলাডোবা ও ডুয়ার্স হয়ে নিউ কোচবিহার কিংবা আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত যাওয়ার পথেও অনেক নদী পড়ে। যেমন— সাহু, তালসা, করলা। এ ছাড়াও উপরি-উল্লিখিত নদীগুলির পাশাপাশি শিলতোর্সা, ডুডুয়া, পাগলি, সুজনাই, পানাসহ ছোটবড় অসংখ্য নদী ও ঝোরা— সবই মনকে মুগ্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এক-একটি নদীর প্রবাহে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পিছনে রয়েছে অনেক ইতিহাস, গল্পগাথা। আছে বর্ষার সময় দু'কূল ছাপিয়ে যাওয়ার ঘটনাবলি— স্থানীয় মানুষ, প্রশাসন ও প্রকৃতির কথা আর যন্ত্রণা। এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদীই ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কারণে ব্রহ্মপুত্র গোষ্ঠীর বলে পরিচিত। অপর দিকে মহানন্দা, বালাসন বা মেচি নদী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সবশেষে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে বলে এদের গঙ্গা গোষ্ঠীর নদী বলা হয়ে থাকে। এই দুই গোষ্ঠীর নদীগুলির গতিপ্রকৃতি আর বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুর্বার, ভয়ংকর হয়ে ওঠার কথা— এসবই বিভিন্ন তথ্য, সাক্ষাৎকার আর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এখানে।

জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, রেসকোর্স পাড়ার জেলা গ্রন্থাগারে বইপত্র, পুরনো পত্রপত্রিকা ঘেঁটে জেনেছি, হিমালয়ের পাদদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নদীবেষ্টিত এই এলাকার নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসবিদ অরুণভূষণ মজুমদারের বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজদের আগমনের আগে এই অঞ্চলে বড় জনবসতি ছিল কেবল দু'টি জায়গায়— দেশীয় রাজ্য কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। বাদবাকি জায়গা ছিল ঘন অরণ্য ও জলাভূমি। এ ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস ছিল কোচ, মেচ, রাভা জনজাতির। সেই সময় নদীগুলি স্বমহিমায় বিরাজ করত। এর পর সময়ের গতিপ্রবাহে সভ্যতার বিবর্তনে নানা পরিবর্তন ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চলে নদীর পাড়ে, জঙ্গলের ধারে গড়ে ওঠে চা-বাগান, জনবসতি। ইংরেজদের কাছে হিমালয়ের এই নিচু সমতল এলাকা মনে হয়েছিল চূড়ান্তভাবেই বসবাস অযোগ্য। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠার পিছনে প্রধান ভূমিকা ছিল পাহাড় থেকে নেমে আসা এই নদীগুলির। নিয়মিত বন্যা পুরনো বসতি এলাকাকে ধুয়ে নিয়ে যেত। ফলে বসবাসকারী জনজাতির মানুষ নিজেদের বসতিও পালটাতে বাধ্য হত। সিন্ধু সভ্যতার মতো এই অঞ্চল নদীমাতৃক হওয়া সত্ত্বেও কোনও সভ্যতা গড়ে ওঠেনি বা বলা যায়, সুযোগও ছিল না। দুরন্ত বন্যার ফলে এই অঞ্চলের নদীগুলি 'বন্ধু' নদী ছিল না, এখনও নেই। এর পর অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে এই নদীগুলি দিয়ে।

বিগত পাঁচ দশকে একের পর এক ছোট-বড়-মাঝারি বন্যা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে গ্রাম-শহরসহ বনবস্তি, বন্য প্রাণ, চা-বাগান প্রভৃতি। নদী, বন্যা— এই শব্দগুলি এখানে একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বর্ষার দিনগুলিতে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, নবগঠিত আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এমন কোনও নদী নেই, যেখানে বন্যা না হতে পারে।

এই অঞ্চলে যে গড় বৃষ্টিপাত, তার ৮০-৯০ শতাংশ হয় জুন-জুলাই মাসে। আর বেশি বর্ষাই তখন বন্যার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান ড. সুবীর সরকারের বক্তব্য, বিগত ২৫-৩০ বছরের তুলনায় সম্প্রতি এই অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০-২৫০ মিলিমিটার হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত বা 'ইনটেন্সিভ রেনফল' বা 'হঠাৎ করে লাগাতার বৃষ্টিপাত' বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এর ফলে নদীগুলির দু'কূল ছাপিয়ে জল উপচে পড়ছে বিপুল বেগে। হঠাৎ বৃষ্টির জলে নদীখাত ভরে গিয়ে বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকা, চা-বাগান, বনবস্তি, কৃষিজমি নষ্ট করে, বনাঞ্চল এমনকি বন্য প্রাণীদেরও বিপর্যস্ত করে ফেলে।

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু বলে নদীখাতের ঢালও খুব বেশি। সেই কারণে বন্যার সময় জল জমা (ওয়াটার লগিং) হওয়ার সমস্যা তেমন নজরে আসে না। মহানগর কিংবা রাজধানীর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে যাঁরা বসে থাকেন কিংবা বন্যা-পরবর্তী সময়ে যাঁরা হেলিকপ্টারে আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁদের চোখে অধিকাংশ সময় নদীগুলির উপচে পড়া জল চোখে পড়ে না। স্বভাবতই তাঁরা এই অঞ্চলের বন্যাকে বন্যা বলে মানতেই চান না। সেটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হয়ে ওঠে এই এলাকার মানুষের কাছে।

বর্ষারও পরবর্তী সময়ে তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা-রায়ডাক-কালজানি-সংকোশ ও তার শাখানদীগুলির অধিকাংশরই উৎস প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান। ভুটান পাহাড় সংলগ্ন এলাকার বৃষ্টিপাত, সেখানকার ভূমিক্ষয়, ভূমিধস— সব কিছুরই প্রভাব পড়ে এ রাজ্যের প্রান্তিক জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার প্রভৃতি এলাকায়।

নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার প্রায় সমস্ত নদীই বন্যাপ্রবণ। উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক শহর শিলিগুড়ি (পুরোপুরি নয়)-কে বাদ দিলে জলপাইগুড়িতে তিস্তা, করলা, আলিপুরদুয়ারে কালজানি, ডিমা, কোচবিহারে তোর্সা, মরাতোর্সা, মালবাজার এলাকায় মাল, ন্যাওড়া, ধূপগুড়ি এলাকায় জলঢাকা, ফালাকাটায় তোর্সা, ওদলাবাড়িতে চেল, কুমলাই, মাথাভাঙায় তোর্সা, সুটুঙ্গা, জয়গাঁতে তোর্সা এবং তুফানগঞ্জ। সীমান্তবর্তী মহকুমা জুড়ে রয়েছে তোর্সা, সংকোশ, রায়ডাক, গদাধর ও কালজানি নদী থেকে প্রতি বছর বর্ষায় বন্যার আতঙ্ক যেন ওই এলাকার মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

বর্ষায় হঠাৎ শুরু হওয়া বৃষ্টিপাত দীর্ঘ সময় ধরে হলে নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কারণ, নদীবাঁধগুলির বয়সের কারণে এবং অর্থের অভাবে দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় অধিকাংশের অবস্থা নড়বড়ে। এ বছর বিধানসভা নির্বাচনের বিধিনিষেধ পড়ে যাওয়ায় অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই। বর্ষার আগে বিধিনিষেধ লাগু হয়ে যাওয়ার পরও বাঁধ মেরামতির কাজ এখনও শুরু করা যায়নি। যদিও জানা গিয়েছে, সরকারি নিয়মনীতি মেনে টেন্ডারের কাজ হয়ে গিয়েছে এবং অর্থ মঞ্জুরও হয়েছে। তবে খরচের নির্দেশ মেলেনি এখনও। উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শুভংকর চক্রবর্তী অবশ্য জানান, 'আমরা সবরকম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তৈরি। আশা করা যায়, ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই কাজ পুরোদমে শুরু করা সম্ভব হবে।'

বিগত কয়েক দশক ধরে বর্ষার সময় পাহাড়ি এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বড় বড় পাথর বা বোল্ডার নেমে আসে জলপ্রবাহের সঙ্গে। সেই সঙ্গে আসে বালিকণা, নুড়িপাথরও। সেগুলি নদীখাত ভরাট করে পাশাপাশি নদীর নাব্যতাকে অগভীর করে— এমনটাই নদী বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

নদীখাতে জমা হওয়া বোল্ডার, নুড়িপাথর সরকারি সম্পত্তি বলেই বিবেচিত। এতদিন তা মূলত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলেও বর্তমানে তা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় বন দপ্তর এবং বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। ওই বোল্ডার আবার সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশানুসারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যে সমস্ত জনবসতি সংলগ্ন এলাকার উপর দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত, সেখানে জমে থাকা বোল্ডার নদীবাঁধ নির্মাণ বা নদীর পাড় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মবিধি পালনের মধ্যে দিয়েই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সেই প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষিত এলাকা থেকে বোল্ডার এনে তা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াও খুব জটিল বলে নদীবাঁধ বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা।

নদী বলতে আমরা বুঝি, 'এক স্বাভাবিক জলপ্রবাহ, যা মাধ্যাকর্ষণের ফলে উঁচু অঞ্চল থেকে নিচু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র কিংবা হ্রদে মিলিত হয়।' এই দীর্ঘ পথপ্রবাহে জলের মাত্রার যেমন তারতম্য ঘটে, নদীর বাঁক বা গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও তার স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত হয়, নাব্যতা হ্রাস পায়, নদীপাড় সংলগ্ন এলাকায় ভূমিক্ষয় হতে থাকে। বিগত কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষণের জেরে নদীর জল ফুলেফেঁপে অনেক জমি গ্রাস করেছে, যার মধ্যে অধিকাংশই ডুয়ার্সের চা-বাগান আর কৃষিজমি। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন-এর ডুয়ার্স শাখার সচিব প্রবীর ভট্টাচার্যর

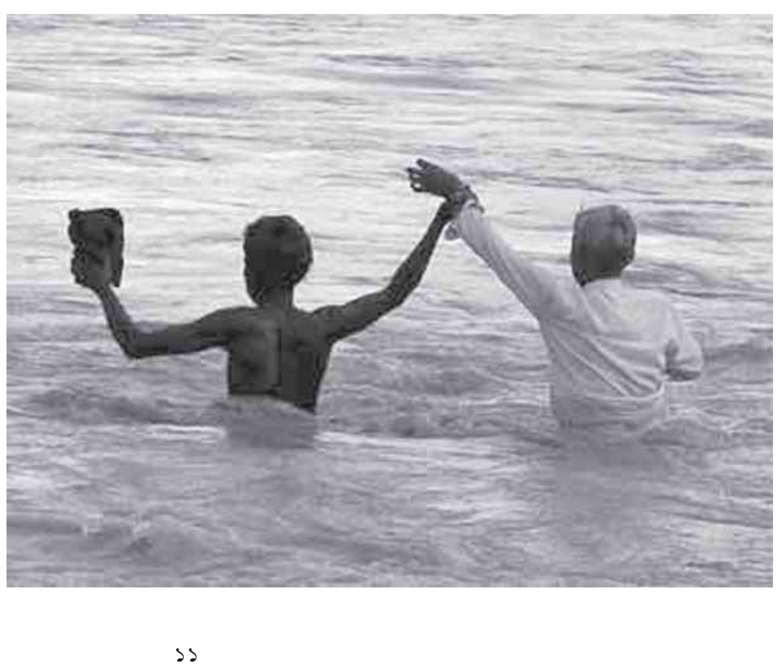

ভূ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হিমালয় সংলগ্ন এই অঞ্চলে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে বন্যা এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বিগত কয়েক দশক বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ, নদী তার গতিপথে যেভাবে তার শক্তিপ্রবাহ দেখিয়েছে, তার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে বলা যায়।

থেকে জানা গিয়েছে, বিগত ২০ বছরে ২৭০ হেক্টরের মতো চা-বাগানের জমি চলে গিয়েছে বন্যায়। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময়ে ৩৫০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে করুণ ও বেদনাদায়ক ছবি দেখতে পাওয়া যায় কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে গত বছর এবং তার আগের বছর কালজানি নদীর মূল বাঁধ ও সহযোগী বাঁধ ভেঙে সাড়ে তিন হাজার বিঘা কৃষিজমির ফসল, বসতবাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে প্রচুর মানুষ ও তাদের পরিবারকে গৃহহীন হতে হয়েছে। এই এলাকার ঝলঝলি বিষ্ণুপুর এলাকায় কালজানি ও গদাধর যৌথভাবে কৃষিজমি ও বসতবাড়ি গ্রাস করেছে বিগত কয়েক বছরে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালে এই অঞ্চলের বন্যা ও নদীবাঁধ সংরক্ষণের জন্য গঠিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন। তারপর দীর্ঘ চার-চারটি দশক অতিক্রান্ত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখনও এই অঞ্চলের নদীবাঁধ সংরক্ষণ বন্যা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়নি, জোটেনি পর্যাপ্ত সহায়তাও। অধিকাংশ নদীরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান থেকে উৎপত্তি হওয়ার পরও ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনের দাবি অবহেলিতই থেকে গিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও, সংসদে বিতর্কের ঝড় উঠলেও কার্যত কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ভূ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হিমালয় সংলগ্ন এই অঞ্চলে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে বন্যা এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বিগত কয়েক দশক বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ, নদী তার গতিপথে যেভাবে তার শক্তিপ্রবাহ দেখিয়েছে, তার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে বলা যায়। প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নদী অববাহিকার উৎসস্থল অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ, সেই সঙ্গে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বন্যা প্রতিরোধের এক সুপরিকল্পিত প্রকল্প। এই অঞ্চলের নদীগুলির বন্যা আজকের প্রেক্ষিতে কোনও জেলা, রাজ্য কিংবা দেশের সমস্যা নয়, এটিকে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় রূপে দেখতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এখানে যা রয়েছে তা শুধু স্বল্পমেয়াদি এবং জোড়াতালি দেওয়া। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, ফসল, এমনকি জীবন কিংবা প্রাণীসম্পদহানির জন্য উপযুক্ত বিমাব্যবস্থা আজও নেই এখানে। চালু হয়নি বন্যার আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য অত্যাধুনিক রিমোট সেন্সিং কনট্রোল সিস্টেম।

বন্যার সময় এই অঞ্চলের বন ও বন্য প্রাণীরাও যথেষ্ট সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটায়। উত্তরবঙ্গের বন্য প্রাণী বিভাগের বনপাল তাপস দাসের মতে, 'বন্যার জল ঢুকে বন্য প্রাণীদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। মহানদী, চাপড়ামারি, গোরুমারা, জলদাপাড়া সংলগ্ন নদীগুলির জলস্ফীতির ফলে বনরক্ষীরা বন্য প্রাণীদের রক্ষা করতে হিমশিম খায়, কারণ এই সময় চোরাশিকারিরা বন্য প্রাণীদের আক্রমণের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়ে।'

হিমালয় সংলগ্ন সমতল এলাকায় নদী-বন্যা-বোল্ডার ও বাঁধ— এসব কিছুই ভৌগোলিক অবস্থান, বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, ফলে প্রয়োজন সচেতনতাবোধ বাড়ানো। নদী ভাঙন প্রতিরোধে দরকার পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণ, স্থানীয় মানুষদের 'রিভার বিহেভিয়ার ট্রেনিং' দেওয়া পাশাপাশি ভারতসহ প্রতিবেশী ভুটান, বাংলাদেশকে নিয়ে যৌথভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসা। তাহলেই নদীগুলি আমাদের কাছে দুর্দশা নয়, আশীর্বাদের বার্তা বহন করে আনবে।

অরুণ কুমার

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১

আমি তো জানতাম না যে, পটলরাম পর্যটকের অটলরামও কবিতা লেখে। তার নতুন কাব্যগ্রন্থ আমায় সে দিন ট্রেকিং-এর পথে উপহার দিল পটলরাম। কিন্তু মুশকিল হল, বইটার নাম 'ভায়ার মাঝে Y'। তা-ই দেখে প্রখ্যাত কাব্যবিশারদ লুপ্তোপমা সান্যাল বললেন, 'আরে! এটা তো একটা সংকেত। অটলবাবু যে গানবাজনার চর্চা করেন, তা জানতে না? ভায়ার মাঝে Y হল...।' না, বলব না। বললে প্রহেলিকা হবে কীভাবে?

২

আমার হেলিকপ্টারটা কিছুদিন হল খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তাই পাইলটকে শিলিগুড়ি পাঠিয়েছিলাম কয়েকটা পার্টস আনাতে। কিন্তু সে ব্যাটা তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। কোথায় আছে জানার জন্য পুলিশে ভরসা না করে জ্যোতিষী প্লুটাদিত্যকে খবর দিতেই তিনি গণনা করে বললেন, 'বিড়ি বা জন।'
'বিড়ি অথবা জন? কোন জন? কী বিড়ি? জন কি কোনও সাহেবের নাম?' আমি ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাই।
'শিলিগুড়ির জেলাতেই।' বলে প্লুটাদিত্য তিনশো এক টাকা দক্ষিণা নিয়ে হাওয়া। অতঃপর আপনারা যদি বলেন তাহলে আমার হেলিকপ্টারটা ঠিক হয়।

গতবারের উত্তর— ১) টোটো, মেচ, কোচ ২) শামুকতলা ৩) মাশান

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

থ্রোয়িং বোল্ডার ইন ফ্লোয়িং ওয়াটার

এখনও নরিবাবু এসে পৌঁছালেন না। এত দেরি তো উনি করেন না। পাতকীবাবু অস্থির হয়ে উঠেছেন। ‘ভোলা-আ-আ, আর-এক রাউন্ড চা দে।’ অলরেডি চার রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। নরহরিবাবু বলতে অসুবিধা হওয়ায় সবাই সংক্ষেপে নরিবাবু বলে ডাকেন। ওঁর পুরো নাম নরহরি গুঁই।

আসলে নরহরিবাবু সরল মানুষ। মনে কোনও জটিলতা নেই। সেচ দপ্তরে চাকরি করেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিস্থলের অনেক মজার ঘটনা বলেন। প্রায় প্রতিদিনই ভোলার দোকানে সন্ধ্যাবেলা চা খান আর আমার সেলুনে ওঁরা চুল-দাড়ি কাটান। সেখান থেকেই ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়, তাও অনেকদিন হল। ওঁদের আড্ডায় আমিও হাজির থাকি। নুটুবাবু ওরফে নটবর শিট চাকরি করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরে। শতকী ভড় পূর্ত দপ্তরে আর আলম মোস্তাফা সেচ দপ্তরে। বাড়ি মুর্শিদাবাদে।

মাঝে মাঝে ওঁরা চারজনে ছুটিছাঁটার দিন কাছাকাছি ঘুরতে যান সাইকেল নিয়ে। কখনও মণ্ডলঘাট, বেরুবাড়ি বা বার্নিশ, কখনও বেলাকোবা, দশদরগা, চাউলহাটি, দোমোহানি, আরও কত জায়গা। কখনও কখনও আমিও ওঁদের সঙ্গী হই। পাতকীবাবু মাঝে মাঝেই নরহরিবাবুকে চটাবার জন্য খোঁচা মেরে কথা বলেন। এই তো ক'দিন আগে তিস্তার বাঁধ ধরে ছয় নং স্পারের দিকে হাঁটছি, হঠাৎ পাতকীবাবু নরহরিবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই যে নরিবাবু, এই যে এখানে বাঁধের উপর এত দূর ঘাস আছে, এখান থেকে দেখুন, ওই যে, ওই অবধি কত মিটার হবে? একশো মিটার তো হবেই, দেখুন ঘাস নেই। মাটিও নরম, মনে হয় নতুন মাটি ফেলা হয়েছে। তা এখানকার ঘাস কী হল? নিশ্চয়ই গোরুতে খায়নি।’— ‘নিশ্চয় খেয়েছে।’ নুটুবাবু ফোড়ন কাটলেন। নরিবাবু বললেন, ‘ফল্যাত্যা কন কী? মনুষ্যে খাইব ক্যান? ইহানে নতুন মাটি ফ্যালা হইসে। কিন্তু নরিবাবু, এ তল্লাট আপনার দায়িত্বে। প্রায় একশো মিটারের মধ্যে ঘাস নেই। হে হে তা হিসাব কতর? নিশ্চই পঞ্চাশ ফাঁকা।’ পাতকীবাবু বাঁকা ইঙ্গিত করেন। নরিবাবু উত্তেজিত হলে মাঝে মাঝে ‘ফল্যাত্যা’ বলেন। এটা ওঁর মুদ্রাদোষ। নরিবাবু ফল্যাত্যা বলে দু'-তিনবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ‘দ্যাহেন, মাটি টাহা, টাহা মাটি— ইটা মানেন তো পাতকীবাবু?’— ‘কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বোধহয় বলেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। আর আপনি বললেন, মাটি টাহা, টাহা মাটি। এটা কি ঠিক হল?’ চেষ্টা করেন।— ‘শোনেন দাদাগণ, আসলে সরকারি দপ্তর সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কিছুটা হলেও বাঁকা ধারণা আছে। তার মধ্যে কিছুটা সত্য তো বটেই, আবার যতটা ধারণা করে, ততটা সত্য নয়।’ পাতকীবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আলমবাবুর কানে কানে বললেন, ‘আরে মশাই, আপনিও পারেন। আসলে কী জানেন? নরিবাবুকে চটিয়ে দিলে উনি যে ভাষা প্রয়োগ করেন, শুনতে ভালো লাগে। মজা পাই।’

এর পর বেশ কয়েকদিন নরিবাবু আর আলমবাবুর পাত্তা নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিস্তার স্পারের কাজে ওঁরা খুব ব্যস্ত আছেন। ওঁদের কাজ দেখার জন্য রবিবার বিকেলে আমরা তিস্তার ছয় নং স্পারে গেলাম। দেখি প্রচুর লোক রাজ করছে। সবাই খুব ব্যস্ত। বাঁধের ধারে তিনটে ক্যাম্প। আমাদের দেখতে পেয়ে নরিবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন— ‘আরে, আহেন আহেন। বুঝলেন না, খুব ঝামেলা।’— ‘কাজের খুব চাপ বুঝি?’ আমি বলি। ‘আর কয়েন না পরামানিকভায়া। এই ছয় নম্বর স্পারের বাঁধ বাঁধনের জন্য দক্ষযজ্ঞ লাগছে। দাঁড়ান, আপনেরা আমার কাজ দ্যাখতে আইছেন। চা কই? অ্যাই গোকলে, এইহানে পাঁচ কাপ চা বানায় আন।’

নুটুবাবু জালিতারের বাঁশ-বাঁধা খাঁচা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওটা কী? ওটা দিয়ে কী হবে?’ নরিবাবু চা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, ‘আরে, ওটারে কয় ‘সু’। রাউন্ড সসেজও কয়। অর ভিতর দ্যাখছেন পাথর ভরা হচ্ছে। অইডা আস্তে আস্তে জলে নামাইয়া দেওয়া হইব। দ্যাহেন দ্যাহেন।’ আমরা দেখলাম ওই ‘সু’টাকে লেবাররা ঠেলে ঠেলে খরতর স্রোতে নামিয়ে দিতেই সড়াৎ করে স্রোত নিমেষে টেনে নিল। অত বড় তারজালি ভরা পাথর কীভাবে মিলিয়ে গেল জলের ভিতরে।

নরিবাবু বললেন, ‘দ্যাগলেন, দ্যাগলেন তো ক্যামনে হাওয়া হইয়া যাইতাছে। এখন দেহি অই যে পরকুপাইন বানাইতাছে বাঁশ দিয়া, অইটা দিয়া কিছু করন যায় কি না। স্পারটারে তো বাঁচান লাগব।’ এই সুযোগে পাতকীবাবু তাঁর কাজ হাসিল করলেন, ‘অঃ, তাহলে একেই বলে— থ্রোয়িং বোল্ডার ইন ফ্লোয়িং ওয়াটার। এতক্ষণে হাতে-কলমে দেখলাম। হুঁ হুঁ নরিবাবু, কয় ট্রাক গেল? হিসেব কী বলে?’ নরিবাবু ইতস্তত করে বলেন, ‘দ্যাহেন, এখন নিজির চখিই দ্যাখলেন তো, আর কিছু বোল্ডার দ্যাহেন এদিক-ওদিক হইবই। মিসলিনিয়াস দ্যাহেন এইরহম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই এলোমেলো হইয়া যায়। সবসময় বাঁকা চাহি সব দেখলি চলে না। এখন কোনও দিকে তাকানোর সময় নাই। এখন বাঁধ রক্ষা করতি হইব। আরে আরে, করস কী! করস কী!’ বলতে বলতে নরিবাবু স্পারের নোজের কাছে দৌড়ে গেলেন।

অখিলেশ দাস

শিলিগুড়ি পুরসভার প্রতি রাজ্য সরকারের অনমনীয় ভূমিকার সুযোগ নেবে বিজেপি

সম্রাট আলেকজান্ডারকে বলা হয় 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট'। এটা যে তিনি দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন, তার জন্য নয়। ইতিহাসে তৈমুর লং থেকে মহম্মদ ঘোরি যেমন ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী, তেমনই রোমান সম্রাটরাও একের পর এক রাজাকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য প্রসারিত করেছিলেন। তাঁরা কেউ কিন্তু 'দ্য গ্রেট'-এর মুকুট পাননি। আলেকজান্ডার পেয়েছিলেন। কারণ, রাজা পুরুর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাঁকে পরাজিত করেও অন্য সব দিগ্‌বিজয়ীর মতো পরাজিত রাজাকে হত্যা বা কারাগারে নিক্ষেপ করেননি তিনি। তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত পুরুকে বন্দি করে রাজ্যসভায় নিয়ে এলে তিনি পুরুকে রাজোচিত সম্মান জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি আমার কাছে কী ধরনের ব্যবহার আশা করেন?' পুরু যখন তাঁর উত্তরে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জীবন ভিক্ষা না করে বলেছিলেন, 'একজন রাজার প্রতি আরেক রাজা যে ব্যবহার করে'— আলেকজান্ডার কিন্তু এই উত্তর একজন পরাজিত শত্রুর ঔদ্ধত্য বলে মনে করেননি। তিনি মহারাজ পুরুকে তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে যে রাজোচিত উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটাই তাঁকে ইতিহাসের পাতায় 'দ্য গ্রেট' বলে অভিষিক্ত করেছে।

উদারতা মানুষকে ছোট করে না, বরং তাকে মহান বলে বরণীয় করে। চরম শত্রু সেই উদারতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে আজ যে শাসকের আসনের অধিকারী হয়, কাল তাকে বিরোধী আসনে বসতে হতে পারে। যেমন ৩৪ বছর নিরবচ্ছিন্ন শাসনক্ষমতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরও ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট গণতন্ত্রের নির্দেশেই তৃণমূলের হাতে শাসনভার তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই গণতান্ত্রিক বিধানে তৃণমূল আবার ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার প্রাসাদে আগামী ৫ বছরের জন্য রাজ্য শাসন করার দণ্ড হাতে পেয়েছে। এর পরের নির্বাচনে শাসনের অধিকারের চাকা কিন্তু আবার ঘুরে যেতে পারে। এটাই তো গণতন্ত্রের সুবাস। এটাই গণতন্ত্রের জিয়নকাঠি। গণতন্ত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী ক্ষমতার কোনও গ্যারান্টি দেয় না। তাই আজকে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা যদি সাংবিধানিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে প্রশাসনকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের সাংবিধানিক অধিকারকে মান্যতা দিতে না চায়, আগামী দিনে তা কিন্তু বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। যেমন ৩৪ বছরের শাসক সিপিএম সেই পাপের দায়কে বয়ে চলেছে। একজন ভুল বা অন্যায় করেছিল বলে একই অন্যায়কে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে যদি বর্তমানের তৃণমূলের সরকার তাকে অনুসরণ করে, আগামী দিনে তারা আবার বিরোধী দলে রূপান্তরিত হলে সিপিএমের মতো সেই পাপের বোঝার যন্ত্রণাকে ভোগ করার সুযোগ পাবে।

ভারতের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো ফেডারেল ধাঁচে গঠিত। অর্থাৎ কেন্দ্রে যে দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজ্যে সেই দলীয় শাসনের সরকার নির্বাচিত না হলেও কেন্দ্র সেই অজুহাতে রাজ্যের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে না। বর্তমানে কেন্দ্রে আছে বিজেপি'র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। রাজ্যে তৃণমূলের সরকারসহ বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী সরকার যেমন আছে, তেমনি আছে বিজেপি দলের রাজ্য সরকারও। বিজেপি'র যে সমস্ত রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের সরকার আছে, তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তারা যেমন দেখাতে পারে না, তেমনি অ-বিজেপি রাজ্য সরকারগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণও করতে পারে না। উভয়ই হবে গণতন্ত্র ও ফেডারেল স্ট্রাকচারের সংবিধান পরিপন্থী।

যেটি সত্য কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সেটি একইভাবে সত্য রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও।

পশ্চিমবঙ্গের রাজপাটে গণতন্ত্রের রায়ে যেমন তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি শিলিগুড়ির পুর নির্বাচনে একই গণতান্ত্রিক রায়ে সিপিএমের নেতৃত্বে পুরসভা গঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের চোখে তৃণমূল শাসিত পুরসভা ও তৃণমূল বিরোধী দল শাসিত পুরসভা— একইভাবে চিহ্নিত হবে বা হবার কথা।

শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম পুরসভা, অবশ্য কলকাতা পুরসভাকে বাদ দিলে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতি সংগত কারণেই শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিজয় চাইতেই পারেন। সেই চাওয়া পূরণ না হলে তিনি হতাশ হতেই পারেন। বামফ্রন্টের জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিজয়ী হলে জ্যোতি বসু চরম হতাশা প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, কলকাতা নিয়ে তাঁদের যে নানা পরিকল্পনা, স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়িত হল না।

কিন্তু কেন এমন ভাবনা হবে?

নির্বাচনের পর সরকার গঠনের পর সেই সরকার তো কোনও দলের নয়, সেই সরকার দেশ তথা রাজ্যের সব মানুষের সরকার। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কোনও দলের মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি সব নাগরিকের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের দেশের সংবিধান তথা রাজনৈতিক বিন্যাস তো চিনের একদলীয় একনায়কতন্ত্রী নয়। এখানে বহুদলীয় সংবিধান।

শিলিগুড়ির মানুষ প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে যেমন এখানকার প্রবল প্রতাপশালী বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে তৃণমূল কংগ্রেস জোটের প্রার্থীকে বিজয়ী করেছিল, তেমনি পুর নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূলের সার্বিক জোট না হলেও বোঝাপড়ার জোটকে বিজয়ী করে শিলিগুড়ি পুরসভাকে সিপিএমের হাত থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কেড়ে নিয়ে তাদের পুরসভা গঠনের সুযোগ দিয়েছিল। সেই জোট মেয়রের ক্ষমতায় কে বসবে, সেই ক্ষমতার লড়াইয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে দিয়েছিল। পুর বোর্ড গঠন করার পরও তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে শিলিগুড়ি পুরবাসীর আস্থা হারাতে শুরু করেছিল।

শিলিগুড়ি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ স্বপ্নের শহর। এই শহর ধরে রাখার চেষ্টায় তিনি

বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বারবার এসেছেন এই শহরে। পরিশ্রমী ও কাজের মানুষ বলে পরিচিত গৌতম দেবের উপর আস্থা স্থাপন করে তাঁকে শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভার সদস্য করেছিলেন তা-ই নয়, তাঁকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ দপ্তর, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিসহ উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের কোর কমিটির প্রধানও করেছিলেন। গৌতম দেব যে তাঁর দায়িত্বপালনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শিলিগুড়ি পুরসভা তো বটেই, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তৃণমূলের দখলে আনার স্বপ্নসহ দার্জিলিং পাহাড়ে তৃণমূলের প্রভাব স্থাপনের ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধরা থেকে যাওয়ায়, গৌতম দেবের উপর তাঁর আস্থায় চিড় ধরেছে বলে রাজনৈতিক মহলের খবর। এই খবরটি অবশ্য আরও পল্লবিত করেছে নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ তৃণমূলের গৌতম দেব বিরোধী লবি। গৌতমবাবু নিজেও তাঁর হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, শিলিগুড়ির মানুষের জন্য এত কিছু করেছেন, তবু শিলিগুড়ির মানুষ তাঁকে কেন সমর্থন করল না, তার আত্মানুসন্ধান করবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, ২৯৪টি কেন্দ্রেই তিনি প্রার্থী, তবু শিলিগুড়ির ভোটদাতারা তাঁকে কেন ভোট দিলেন না, সেই আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিবেদন নয়। আলোচ্য প্রতিবেদনটি একটি নির্বাচিত বিরোধী দল পরিচালিত পুরসভার প্রতি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে।

উদারতা মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। যেমন পরাজিত রাজা পুরুর প্রতি আলেকজান্ডারের উদার ব্যবহার তাঁকে ইতিহাসের পাতায় 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট'-এর অভিধায় অমর করে রেখেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। সিপিএম দলের নেতা হলেও শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের মেয়র অশোক ভট্টাচার্যরও মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশন যেমন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসন সংস্থা, একইভাবে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসন সংস্থা। সরকারের চোখে উভয়ই সমান। কলকাতাবাসী যেমন তাঁদের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতি রাজ্য সরকারের সাহায্যের হাত প্রত্যাশা

নিরুপায় অশোক ভট্টাচার্য বামেদের ছুতমার্গ ছেড়ে বিজেপি সরকারের শরণাপন্ন হয়েছেন, কারণ তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে, উন্নয়ন না হলে শিলিগুড়ি পুরবাসী তাঁকে আর ক্ষমা করবে না। এই সুযোগ নিতে বিজেপিও ভুল করবে না, বলাই বাহুল্য। তৃণমূল সরকারকেও এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

করেন, তেমনি শিলিগুড়িবাসীও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একই রকম ব্যবহার আশা করে।

অশোক ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। আজ সেই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছিলেন বিরোধী তৃণমূলের নেতা। শিলিগুড়ি নগরায়ণের ভাবনা নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য যখন মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, ফিরহাদ হাকিমের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে সেই সাক্ষাতের সুযোগ না পেয়ে ফিরে আসেন, সেটা কিন্তু ব্যক্তি বা সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যর ফিরে আসা নয়, শিলিগুড়ির মেয়রের ফিরে আসা।

ক্রমবর্ধমান শিলিগুড়ি শহরের নগরায়ণের নানা সমস্যা ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এমনি না পারলে ভাতে মারার নীতি কিন্তু গণতন্ত্রে অচল। শিলিগুড়ি শহরের নগরায়ণের সমস্যা তো রাজ্যেরও সমস্যা। শরীরের এক জায়গায় অসুখ বাসা বাঁধলে যেমন বলা যায় না, এটি একটি অঙ্গের সমস্যা, তেমনি শিলিগুড়ির জটিল সামাজিক ও জনবিন্যাসের চরিত্রকে মাথায় রেখে যদি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা করা হয়, তবে ওই পুঞ্জীভূত সমস্যা যে রাজ্যেরই সমস্যা হয়ে তার বাহু বিস্তারের সুযোগ নেবে, সেই সম্ভাবনার কথা না ভাবলে ভবিষ্যতে বিপদ যে ঘটবে, রাজ্যের অভিভাবক হিসেবে রাজ্য সরকারকে তা ভাবতে হবে।

শিলিগুড়ির পশচাৎভূমি শুধু উত্তরবঙ্গের সব জেলাই নয়, সিকিম, ভুটানসহ আসামের এক বৃহৎ অংশও। এই শহরের নগরায়ণের গতি যদি স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে সামগ্রিকভাবে উত্তরবাংলার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে, কলকাতার অর্থনীতি তথা জনজীবনের প্রবাহ শুধু কলকাতা মহানগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বা নির্ভরশীল নয়। শহরতলিসহ এর পশ্চাৎভূমি অঞ্চল থেকে যে অসংখ্য মানুষ এই মহানগরীতে নানা অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আসেন, সেটাই মহানগরীর জীবনস্রোতকে প্রবহমান করে রেখেছে।

রাজ্য সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার রাজনৈতিক সুযোগ নিতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আসরে নেমে পড়েছে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্যর আবেদনে সাড়া দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে একটি রাজ্য সরকারের পুর প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তার আলোচনার জন্য শিলিগুড়ির মেয়রের সঙ্গে কেন্দ্রের তিনটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীদের বৈঠকের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন।

রাজ্যের মানুষ রাজনীতি চাইলেও রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে পছন্দ করেন না। এই শহরের মেয়র যখন রাজ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে শিলিগুড়ি পুরসভা তথা নগরায়ণের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাতের চেষ্টা করেও সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছেন না, তখন বিজেপি'র সদস্য হয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র এই উদ্যোগকে অনেকেই যে স্বাগত জানাচ্ছেন, সেটা কিন্তু বিজেপি'র লাভের ঝুড়িকেই ভারী করবে। মনে রাখতে হবে, বিজেপি ডুয়ার্সসহ উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় তাদের প্রভাব ইতিমধ্যেই বিস্তার করেছে। শিলিগুড়িতে বিগত নির্বাচনগুলিতে বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট কম নেই। অতএব পুরসভার উন্নয়ন না হলে শিলিগুড়ির বীতশ্রদ্ধ মানুষ আগামী দিনে যে বিজেপিকে বেছে নেবে না তার কোনও গ্যারান্টি দেবেন কেউ? তলিয়ে যাওয়া বামপন্থীরা বা নড়বড়ে তৃণমূল সংগঠন কেউই নয়।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হবার মতো 'মমতা দ্য গ্রেট' হলে ক্ষতির থেকে যে লাভের পাল্লাই ভারী হবে। আর তার সোপান হল উদারতা।

সৌমেন নাগ

খালি চোখে ডুয়ার্স

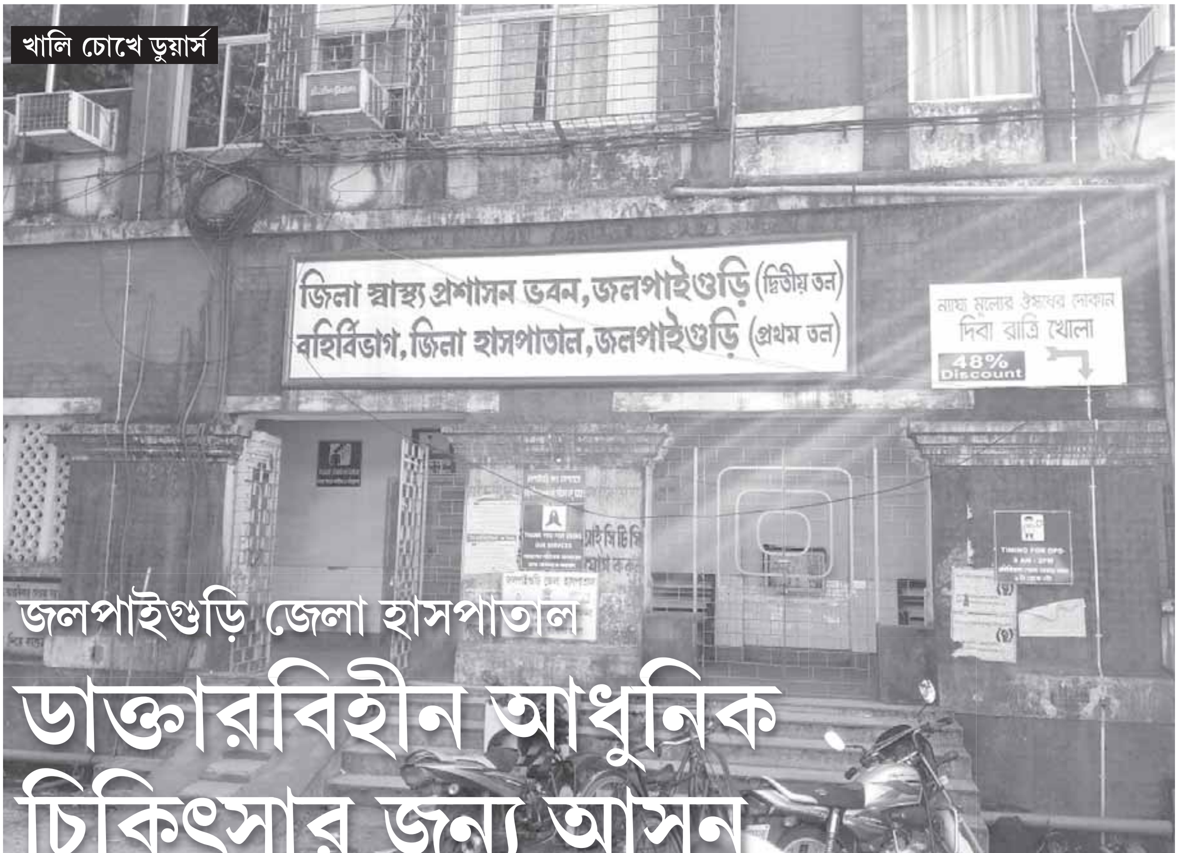

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল

ডাক্তারবিহীন আধুনিক চিকিৎসার জন্য আসুন

শুভসূচনা

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের একটি ব্যাপার জোর গলায় ঘোষণা করার মতো। তা হল এই যে, হাসপাতালটি দালালচক্র থেকে মুক্ত। অবশ্যি এটা বর্তমান ঘাসফুল সরকার কিংবা আগের হাতুড়ি সরকারের সাফল্য নয়। স্থানীয় মানুষের সচেতনতার কারণেই জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে দালালচক্র কখনওই খাপ খুলতে পারেনি। তাই রোগী ভরতির ক্ষেত্রে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষকে দালালের হাতে পড়ে নাকাল হতে হয়েছে, এমন ঘটনা শোনা যায় না। রাজ্যের হাসপাতালচিত্রে দালালদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাই এই হাসপাতালকে ব্যতিক্রম বলা যেতেই পারে।

গোড়ার গলদ

হাসপাতালে অসুস্থ মানুষ আসে চিকিৎসার জন্য। এর জন্য চাই ডাক্তার। অথচ জেলা হাসপাতালটিতে অধিকাংশ রোগের ডাক্তারই নেই। হার্ট স্পেশালিস্ট, গ্যাস্ট্রোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট— এঁদের দেখাই পাওয়া যাবে না। এমন নয় যে সমস্যাটা হাসপাতাল ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের। বস্তুত, জেলার এই হাসপাতালটি জনাকয়েক ফিজিশিয়ান, স্ত্রীরোগ আর শিশু বিশেষজ্ঞ দিয়েই চলছে বলে অভিযোগ। বিরক্ত রোগীদের আশা যে, খুব তাড়াতাড়ি এই হাসপাতাল দেশের প্রথম 'ডাক্তারহীন' হাসপাতাল হিসেবে রেকর্ড করবে।

আউটডোর আর ইমার্জেন্সি

বর্তমান হাসপাতালটি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ঝাঁ-চকচকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। আউটডোরটি নাকি সেখানে চলে যাবে সবার আগে। স্থানীয় মানুষের সন্দেহ যে, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বাইরে থেকে দারুণ দেখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু ভিতরে তো সেই গুটিকয়েক ডাক্তারই থাকবে। জেলা হাসপাতাল তার বর্তমান জায়গা থেকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে গেলেও আখেরে লাভ কিস্‌সু হবে না। আর, আউটডোর নতুন জায়গায় এবং বাকি হাসপাতাল পুরনো জায়গায়— এইরকমটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে প্রথম দিকে। তাহলে তো অতিরিক্ত ভোগান্তির গ্যারান্টি! সরকার চাইছে বর্তমান হাসপাতালটি নতুন সুপার স্পেশাল ভবনে নিয়ে যেতে। কেবলমাত্র প্রসূতি সংক্রান্ত বিভাগটিই থাকবে বর্তমান হাসপাতাল জুড়ে। পরিকল্পনা অবশ্যই সাধু। কিন্তু এসব ঘটতেও তো বছরকয়েক গড়াবে। তার আগে? বর্তমান হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগটিও পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে বিব্রত। একাধিক অ্যাম্বুলেন্স এলে ঢোকার জায়গাই পাওয়া যায় না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স যখন এই বিভাগের দিকে ছুটে আসে, তখন অবস্থা দাঁড়ায় 'ট্রাফিক জ্যাম'-এর মতো। ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে জায়গা বাড়িয়ে কিছু একটা করার কথা কি সরকার ভাবেনি? অবশ্যই ভেবেছে। ভেবে ভেবে কয়েক বছর পারও করে দিয়েছে। পরিকল্পনা আর নকশা নিয়ে গন্ডা বিশেক মিটিং-ইটিং করে প্রবল ব্যস্ততাও দেখিয়েছে। শুধু কাজটা শুরু করতে পারেনি।

নার্স, আয়া এবং...

হাসপাতালে ডাক্তার আর নার্সদের নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা চলে। 'অভাব'-এর প্রতিযোগিতা। কে সংখ্যায় কত কম থাকতে পারে— সেই কম্পিটিশন। বিধি মানলে কিঞ্চিৎ গুরুতর রোগীর ক্ষেত্রেও দু'জন পিছু একজন নার্স থাকা দরকার। অভাবের সংসারে না হয় চারজন পিছু একটি নার্স মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু গোটা ওয়ার্ডে তিনজন নার্স দেখলে ভিরমি খাওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রসূতি বিভাগে, শিশু বিভাগে এইরকম 'নার্সবিরলতা' রোজকার ছবি। নার্সরা তো রোবট নন। চল্লিশটা বেডে গুঁতোগুঁতি করে শুয়ে-বসে থাকা দেড়শো রুগির স্যালাইন-ইঞ্জেকশন-ওষুধ দু'-তিনজন মিলে কাঁহাতক সামলাতে পারেন? ফলে 'মাসি' বা 'আয়া'দের ভার্চুয়াল পদোন্নতি ঘটে। তাঁরা স্যালাইন লাগান, খোলেন। দারোয়ান এসে শিশুর নাকে 'গ্যাস'-এর মুখোশ লাগান। গ্রুপ ডি স্টাফ ছুরি-কাঁচি আর সেলাইয়ের সুতো নিয়ে আউটডোরে 'মাইনর অপারেশন' চালান। বিষ

প্রকৃতি অনুযায়ী বর্জ্য পদার্থ ভরা হয় নির্দিষ্ট রঙের ব্যাগে। নিয়মটা ভাল। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলা হাসপাতালের কর্মীদের ‘কালার ব্লাইন্ড’ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। নয়ত হলুদ ব্যাগে যা ভরার কথা তা কালো ব্যাগে ভরে দিচ্ছে কারা? এর ফলে বর্জ্য নিষ্কাশনের বিজ্ঞান মুখ থুবড়ে পড়ছে নিত্যদিন।

খেয়ে কুপোকাত হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে পাকস্থলী সাফাই করার কাজ অবশ্যই ডাক্তার করবেন— এটাই নিয়ম। বাস্তবে তেমন রোগীর গলা দিয়ে পাইপ ঢোকানোর কাজটা খইনি চিবুতে চিবুতে যিনি বা যাঁরা করেন, তাঁরা এমবিবিএস-এর বদলে এমএফ ডিগ্রিপ্রাপ্ত। মানে ম্যাট্রিক ফেল আর কী!

সিসিইউ, টেস্ট

জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আছে এটা। করোনারি কেয়ার ইউনিট বলেই সবাই জানে। কিন্তু পেটের ব্যামো কিঞ্চিৎ জোরদার হলেও রোগীকে সেখানে পাঠিয়ে দেন ডাক্তারবাবুরা। রসিকজনের মতে, সিসিইউ হল রোগীদের সান্ত্বনা দেওয়ার ইউনিট। সেখানে একজন ডাক্তার আর নার্স তো থাকেন। কোনও রোগীর সঙ্গে পেশিবহুল আত্মীয়পরিজন থাকলে সিসিইউ খুব কাজে দেয়। হাড়ভাঙা এক রোগীর পরিজনরা সে দিন নাকি খুব ‘গরম’ দিচ্ছিল নার্সদের। সে রোগীকে ‘সান্ত্বনা’ ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পত্রপাঠ।

হাসপাতালে পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে অনেকরকম। ভোলাবাবুর হয়েছিল পেটব্যথা। ডাক্তার নিদান দিলেন আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে। পেট চেপে ভোলাবাবু সেই টেস্ট করাতে গিয়ে মাত্র নব্বই দিন পর ডেট পেয়েছিলেন। গড়ালবাড়ির মজলু হকের জরুরি রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পরদিনই দরকার ছিল। তাঁকে বলা হয়েছে আট সপ্তাহ পর রক্ত নেওয়া হবে। এইসব কারণে শহরে বেসরকারি ল্যাবের মালিকদের মুখের ছবি ফুরাচ্ছেই না!

আরও আছে। যেমন এক বিছানায় একাধিক রোগীকে স্থান দেওয়া। এটা স্থানাভাবের কারণে হয়ত মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এরও তো একটা বিজ্ঞান আছে! জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে পক্স আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়ে দেওয়াটা বোধহয় হাতুড়ে চিকিৎসাতেও অনুমোদিত নয়। অথচ সদর হাসপাতালে এসব ঘটে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশে বুকে ব্যথা নিয়ে আসা রোগীকে স্থান দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই চলে।

আরও এবং আরও

হাসপাতালে নানারকম বর্জ্য উৎপন্ন হবে, সেটা সবাই জানে। সেসব বর্জ্য ঠিকমতো সংগ্রহ করে আনার জন্য তিন রঙের প্লাস্টিকের থলে ব্যবহার করা হয় হাসপাতালে। প্রকৃতি অনুযায়ী বর্জ্য পদার্থ ভরা হয় নির্দিষ্ট রঙের ব্যাগে। নিয়মটা ভাল। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলা হাসপাতালের কর্মীদের ‘কালার ব্লাইন্ড’ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। নয়ত হলুদ ব্যাগে যা ভরার কথা তা কালো ব্যাগে ভরে দিচ্ছে কারা? এর ফলে বর্জ্য নিষ্কাশনের বিজ্ঞান মুখ থুবড়ে পড়ছে নিত্যদিন। কোটির বেশি টাকা খরচ করে বছর দশেক আগে একটা যন্ত্র কেনা হয়েছিল। সেটা বর্জ্যের আয়তন চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কমিয়ে আনে। সে যন্ত্র এখনও চালু করা যায়নি। পড়ে থেকে বোধহয় নষ্টই হয়ে গিয়েছে। এমন আরও কিছু মূল্যবান যন্ত্র খাবি খাচ্ছে হাসপাতালের কোনও ধূলিধূসরিত কক্ষে।

ব্লাড ব্যাঙ্ক বলেও একটা ব্যাপার আছে এই হাসপাতালে। সেখানে তিন শিফ্‌টে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেওয়ার জন্য তিনজন এবং কেবল তিনজনই স্টাফ। কেউ একদিন আটকে গেলে নাইট শিফ্‌ট বন্ধ। রাতে রক্তের জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কের দরজা খুলতে গেলে ডাকাডাকি করে লাভ নেই। প্রচুর গালিগালাজ আর দরজায় গন্ডা দশেক লাথি মারার পর কেউ একজন ঢুলতে ঢুলতে বেরিয়ে এসে বলেন, ‘কলিং বেল চাপলেই তো শুনতে পেতাম।’ যদিও সে বেল চেপে দেওয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেও কোনও শব্দ বার হয় না।

আসলে চকচকে বিল্ডিং, নীল-সাদা প্রলেপ, আলো, পাখা, যন্ত্র— এই দিয়ে হাসপাতাল চলে না। চাই মানুষ। চাই ডাক্তার। চাই নার্স, কর্মী, বিশেষজ্ঞ, টেকনিশিয়ান। রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আগে ছিলেন গৌতম দেব। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি থেকে সাংসদ হলেন বিজয়চন্দ্র বর্মন। তখন থেকেই তিনিই এই পদ সামলাচ্ছেন। ৪৮ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ কেনার জন্য দোকান চালু হয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। ডাক্তারদের লেখা ওষুধের ৮৪ শতাংশই সেখানে পাওয়া যায় না। বিরক্ত রোগী ও ভুক্তভোগীদের মতে, অভিযোগ জানালে হাসপাতালের সুপার কেবল মাথা চুলকান আর রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কেবল হাসেন।

এটাই স্বাভাবিক। এঁদের সবার ঘাড়েই একটা করেই মাথা। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল ‘মডেল’ হাসপাতাল। দিদি বলেছেন। বরাদ্দেরও অভাব আছে বলে শোনা যায় না। বিশ্ব ব্যাংকও নাকি টাকা দিচ্ছে। তদুপরি বিশাল সুপার স্পেশালিটি হচ্ছে মাষকলাইবাড়ির কাছে। শ্মশান থেকে হাসপাতালের দূরত্বও কমে যাচ্ছে এর ফলে। অনুমান এই যে, ভবিষ্যতে রোগীরা এসি ঘরে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে থাকবেন, এবং ডাক্তারের আশায় প্রহর গুনতে গুনতে বিনা চিকিৎসায় ‘ভালভাবে’ প্রাণত্যাগ করে মাষকলাইবাড়ি শ্মশানে হাজির হবেন।

রাজ সরকার

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

কোচবিহারের মানুষ চাইছে তোর্সার দ্বিতীয় সেতু !

বলাই বাহুল্য, সেতুবন্ধনই তৃণমূল সরকারকে বিপুলভাবে ফিরিয়ে এনেছে, উত্তরবঙ্গে পেয়েছে অভাবনীয় জয়। আধ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু দূরত্ব কমিয়ে দিতে পারে ১৪ কিমি।

ছোটবড় নদীবেষ্টিত রাজ্যের প্রান্ত জেলা কোচবিহার। সেতুবন্ধন এখানকার উন্নয়নের সমার্থক স্লোগান। কোচবিহার সিতাই ব্লকের সঙ্গে দিনহাটার সরাসরি যোগাযোগের জন্য তৈরি হচ্ছে আদাবাড়িঘাট সেতু। তুফানগঞ্জের দেওচড়াই থেকে বলরামপুরের যোগাযোগের জন্য ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে কালজানি সেতু। মেখলিগঞ্জের তিস্তার জয়ী সেতু তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার কোচবিহার শহরের সঙ্গে সদরের ১ নং ব্লকের যোগাযোগব্যবস্থা নিবিড় করতে তোর্সার ফাঁসিরঘাট এলাকায় একটি সেতু তৈরির দাবি ঘনীভূতহচ্ছে। এখানে একটি সেতু তৈরি হলে কোচবিহার শহরের সঙ্গে মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার ১ নং ব্লকের বিকল্প পথ তৈরি হবে।

সময়ের বিবর্তনে গ্রামীণ জীবনের পটপরিবর্তন হয়েছে। প্রতিদিন এই ব্লকের সাহেবের হাট, শুটকা বাড়ি, তাপুরহাট, পসারির হাট, চাঁদামারি, চিল্কিরহাটসহ বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে সাইকেল ও বাইকে ফাঁসিরঘাট দিয়ে নদী পারাপার হন। এই যোগাযোগের ফলে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথের দূরত্ব কমে। এখন দাবি এই পথে পাকা সেতুর। ফাঁসিরঘাট, যেখানে শুখা মরশুমে থাকে বাঁশের মাচা। পোশাকি নাম ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ। শান্ত-স্নিগ্ধ তোর্সার অবস্থার উপর নির্ভর করে ফাঁসিরঘাটের যাতায়াত। এই পথে নৌকা ভরসা হলেও ভরা বর্ষায় নৌকা চলাচল বন্ধ থাকে। বাঁশের সাঁকো ও নৌকায় পারাপার চলে প্রায় ছ'মাস।

> ফাঁসিরঘাট, যেখানে শুখা মরশুমে থাকে বাঁশের মাচা। পোশাকি নাম ফেয়ারওয়েদার ব্রিজ। শান্ত-স্নিগ্ধ তোর্সার অবস্থার উপর নির্ভর করে ফাঁসিরঘাটের যাতায়াত। এই পথে নৌকা ভরসা হলেও ভরা বর্ষায় নৌকা চলাচল বন্ধ থাকে। বাঁশের সাঁকো ও নৌকায় পারাপার চলে প্রায় ছ'মাস।

এ প্রসঙ্গে ছাত্র নেতা শংকর দেবনাথ বলেন, 'শুধু শহরের সঙ্গে সদরের যোগাযোগই নয়, শিক্ষার উন্নতিতেও এই সেতু নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন।' এই সেতু নির্মাণ হলে গোটা ১ নং ব্লকের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে মনে করেন কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ খোকন মিঞা। তিনি বলেন, 'দাবি উঠেছে ফাঁসিরঘাটে তোর্সা ব্রিজের। এই দাবিকে মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের গোচরে নিয়ে আসা হবে।' কোচবিহার পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন,'এখানে সেতু নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। শুধু পথের সাশ্রয় নয়, বিকল্প যোগাযোগব্যবস্থার পথ খুলে গেলে শহর ও শহরতলির নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং এই সেতুবন্ধন হলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথ হয়ে উঠবে এটাই।' স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন, সেতু বানানোর আগে এ বিষয়ে নদী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে এই দাবির প্রেক্ষিতে ফলপ্রসূ ভাবনা ভেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে।

এই পথে প্রতিদিনের যাতায়াতকারী রাজমিস্ত্রি মকবুল হকের ভাষায়, 'এখানে সেতু নির্মাণ হলে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড হবে। কারণ শহরাঞ্চলে এই পথ দিয়ে হাজার দুয়েক রাজমিস্ত্রি, তার জোগানি যাতায়াত করে, মূলত সাইকেলই এদের ভরসা। ভরা বর্ষায় দারুণ কষ্ট ঘুরপথে যাতায়াতের। তাই আমরা চাই এখানে একটা পাকা সেতু।' শিক্ষক দম্পতি সমীরণ ও পম্পা মজুমদাররা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলে ফেললেন, 'এ বিষয় নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করা উচিত। আমরা চাই কোচবিহারের বিধায়ক ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করুন। এই সেতুবন্ধন হলে উন্নয়নের এক নতুন দিশা পাবে কোচবিহার।' কোচবিহারের বাসিন্দাদের অভিমত, রাজ আমলে তৈরি বাঁধ বরাবর রাস্তা তৈরি হচ্ছে শহরকে বাইপাস করে। এবার এই সেতু তৈরি হলে মাথাভাঙা, শীতলকুচির মানুষ নিউ কোচবিহার বা তুফানগঞ্জ হয়ে আসামের পথে পৌঁছে যাবে অর্ধেক সময়ে। নিঃসন্দেহে সেটি হবে একটি ঐতিহাসিক উন্নয়ন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি

আসলে ভোটে জেলাজুড়ে বিপুল জয়ের উৎসব

গত পনেরো দিন ধরে ডুয়ার্স জুড়ে চলেছে অবিরাম বর্ষণ। কালজানি, তিস্তা, রায়ডাক, সংকোশ, চেলি নদীর জল হু হু করে বাড়ছে। ১৯৯৩-এর ভয়ংকর বন্যার কথা এখনও ভুলতে পারেনি আলিপুরদুয়ারের মানুষ। কিন্তু এসব ছাপিয়ে আলিপুরদুয়ার জুড়ে উৎসাহের বান বয়ে গেল তিনদিন ধরে। ২৫ জুন দীর্ঘ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় যার সূচনা তার মহা সমাপ্তিতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো হাজির থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং, যাঁর উদ্যোগে দু'বছর আগে পৃথক জেলা হিসেবে 'মুক্তি' পেয়েছিল আলিপুরদুয়ার।

সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচটি আসনের চারটিতেই বিপুল জয়ের আনন্দ ও তারপর দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম ডুয়ার্স সফরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো—সব মিলিয়ে যে দ্বিতীয় জন্মদিন পরিণত হয়েছিল এক 'মেগা সেলিব্রেশন'-এ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

> দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীকে মহা সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ডুয়ার্সের মানুষের পক্ষ থেকে।

গত সাতদিন ধরে যেন দীপাবলী পালন চলছিল আলিপুরদুয়ারে, আলোয় আলোয় সেজে উঠেছিল গোটা শহর, অলিগলি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্রসংগীতের সুর—সব মিলিয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে পৌঁছেছিল গোটা শহর।

শুরুর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন জেলার প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতারা, প্রশাসনিক প্রধানরা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনের কর্মীরা, নানা জনজাতির লোকশিল্পীরা ও কয়েক হাজার মানুষ। সন্ধ্যায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক তথা উৎসবের কাণ্ডারী সৌরভ চক্রবর্তী, জেলার অন্যান্য বিধায়করা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা।

দ্বিতীয় দিন ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হয় জেলার সাড়ে তিনশো ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এবং ১১৯ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে। আর শেষদিন অঝোরে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হয় মানুষ, সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী এসে হাজির হন। জন্মদিনের উপহার হিসেবে ঘোষণা করেন বেশ কিছু প্রকল্প যেমন কৃষিবাজার, আইটিআই ভবন, পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প ইত্যাদি। জেলা শহরে নতুন প্রশাসনিক ভবন, নতুন পুলিশ লাইন, জেলা হাসপাতালে নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি ঘোষণা শহরের মানুষকে খানিকটা হলেও উজ্জীবিত করেছে।

পরিতোষ সাহা

মন কিন্তু ভরল না আলিপুরদুয়ারের

তিনদিনব্যাপী জন্মোৎসব পালনের পর ঈষৎ ক্লান্ত শহর যখন রোজকার ছন্দে ফিরে আসছে, শহর থেকে দূরে চা-বাগানের অস্থায়ী সভাঘরে বসে মুখ্যমন্ত্রী যখন জেলা প্রশাসনিক বৈঠক করছেন তখন শহরের নানা প্রান্তে ফিসফাস যেসব আলোচনা চলছিল তা হল, আলিপুরদুয়ার জেলা ও শহরের মানুষ কী কী পেল? কারণ প্রথমবার বিধায়ক হওয়ার পর স্থানীয় মানুষের আশা ছিল সৌরভ এবার গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রী হচ্ছেনই। কিন্তু সে আশা পূরণ হল না। তারপর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান পদ পেলেন সৌরভ। কিন্তু তবু আলিপুরদুয়ারের সাধারণ মানুষ হতাশ, এতে আমাদের কী লাভ হল বলুন? দিদি যদি সত্যি চান আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন তবে তা তো সৌরভের হাত দিয়ে হতে হবে তাই না? সৌরভের অনুমগামীরা খানিক বিমর্ষ হলেও সান্ত্বনা দিতে থাকলেন, দাঁড়ান, জন্মদিনে এসে দিদি নিশ্চয়ই ভাল ভাল কিছু শোনাবেন। কিন্তু বৃষ্টির এক পরিশ্রান্ত সন্ধ্যায় দিদি এসে টানা কুড়ি মিনিট আবেগঘন বক্তৃতা রাখলেন, কিছু প্রকল্পের ঘোষণাও করলেন, কিন্তু জন্মদিনের উপহার দেওয়ার মতো কোনওটাই যে নয়।

এরকম প্রকল্প তো মাঝেমধ্যেই উনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই উদ্বোধন করেছেন, পানে চুন-খয়ের মাখতে মাখতে কোর্ট চত্বরের এক পান দোকানি আক্ষেপ করলেন। সত্যিই তো! পর্যটন নিয়ে অনেক কিছু করবেন বলেও কী করবেন তাও বললেন না, জংশন এলাকার এক পর্যটন ব্যবসায়ীর মন্তব্য, আসলে নির্দিষ্ট করে কিছু না বললে আজকাল আর নিতে চায় না মানুষ— অনেকটা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির মতোই শোনায়।

আর কিছু না হোক আলিপুরদুয়ারকে পর্যটন জেলা হিসেবে ঘোষণা বা নতুন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ ঘোষণা অথবা নিদেনপক্ষে একটি স্টেডিয়াম বা আদিবাসী প্রকল্পের ঘোষণা কোনওটাই হল না— বহু মানুষের গলায় শোনা গেল হতাশার সুর। কেউ কেউ অবশ্য বললেন, ধৈর্য ধরুন, মুখ্যমন্ত্রী এখন আগেপিছে বিবেচনা না করে দুমদাম ঘোষণা করা বন্ধ করে দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার নিয়ে উনি নিশ্চয়ই কোনও

ভাবনা রেখেছেন— সময় এলেই তা কার্যকরী হবে। সেই আশাতেই আবার বসে রইলেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ।

খানিকটা বিপাকে যে পড়লেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতারাও সেটা ঠিক। আবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প ঘোষণার ব্যাপারে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' যে সৌরভকেও কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে তা দেখে কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল কয়েক তৃণমূল নেতাও। তাদের মতে, এত দ্রুত কি সবকিছু পাওয়া যায়? এর জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। কেউ কেউ আবার সৌরভ নিজের আখের ঠিক গুছিয়ে নিচ্ছেন বলে মন্তব্য করতেও ছাড়ছেন না। সব মিলিয়ে এটুকু বলা যায়, জন্মদিন পার করে মন ভাল নেই আলিপুরদুয়ারবাসীর।

সৌরভ পেলেন এসজেডিএ আলিপুরদুয়ার কী পেল?

এবার কি তবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির উন্নয়ন হবে আলিপুরদুয়ারে? সৌরভ এসজেডিএ-র দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বা আলিপুরদুয়ারের এখানে-সেখানে সেই প্রশ্নই ঘুরছে মানুষের মুখে। কারণ, খবরের কাগজে সৌরভ বলেছেন, এসজেডিএ-র এলাকার বাইরেও তিনি এবার উন্নয়নের কাজ করবেন। তার মানে কি তবে দাঁড়াচ্ছে যে, তিনি এসজেডিএ-র অর্থে আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন করবেন? আলিপুরদুয়ার থেকে বিপুল জয়ের পর সেখানকার মানুষের মনে সৌরভকে ঘিরে অনেক আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ায় হতাশ হয়েছে আলিপুরদুয়ারবাসী। এবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পাওয়ায় আরও ঘাবড়ে গিয়েছেন দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা আলিপুরদুয়ার এলাকার জনগণ— তাঁদের মাথাতেই ঢুকছে না, কী করে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির উন্নয়নের টাকায় সৌরভ আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন ঘটাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাম-আমলেই অশোক ভট্টাচার্যর উদ্যোগে এসজেডিএ-র আওতায় মালবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, তদানীন্তন আলিপুরদুয়ার মহকুমা পড়ে থাকে সেই তিমিরেই। পরবর্তীকালে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে জয়গাঁর সঙ্গে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জয়গাঁ-কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে দেন জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী। জেলা হওয়ার পর আলিপুরদুয়ারের মানুষ উন্নয়নের আশায় ভোট দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি সৌরভ চক্রবর্তীকে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পর দু'-দু'টি পদ পেলেও তা কাজে লাগেনি বলেই অভিমত সংশ্লিষ্ট মহলের। দ্বিতীয়বার হতাশ জনগণ তাকিয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রীর নয়া ঘোষণার দিকেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাখি বিমানে কলকাতা পাড়ি দেওয়ার সাহস নেই স্যার !

> সবার একই কথা, ৫০ বা ৭০ আসনের বিমান নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, এত দিন অপেক্ষা করল এখানকার মানুষ, রানওয়ে বাড়ানোর জন্য আরও না হয় কিছুদিন ধৈর্য ধরা যেতেই পারে।

ফেসবুক বলছে, বিষয়টি নাকি হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। তবু হাল ছাড়তে নারাজ মন্ত্রীমশাই। দায়িত্ব পেতেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ব্যাটন নিয়েছেন। তাঁর অদম্য এই ইচ্ছাশক্তিকে কুর্নিশ করতেই হয়।

কিন্তু মানুষ তো অন্য কথা কয় ! কোচবিহার- আলিপুরদুয়ারের এখন অনেকেই অভ্যস্ত বাগডোগরা থেকে প্রথম বা শেষ উড়ান ধরে কলকাতা পৌঁছাতে। কারণ, রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল হওয়ায় বাগডোগরা গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে ঘণ্টা তিনেক লাগে। ফেরার সময়ও তা-ই। চাপ থাকলে বা ভাড়া বেশি থাকলেও অনেকেই আবার দেখা যায় এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে গুয়াহাটি গিয়ে সেখান থেকে কলকাতা বা দিল্লির বিমান ধরছেন।

কোচবিহারের বিমানবন্দর নিয়ে এইসব নিত্যযাত্রীর সাফ কথা, অন্তত এটিআর বিমান না নামালে হবে না, ন'সিটের বিমান কখনওই যুক্তিসংগত নয়। প্রথম কারণ, ভরতুকির বিশাল পরিমাণ, তুলনায় ভাড়া অনেক বেশি। দ্বিতীয় কারণ, তাঁদের মতে, অবশ্যই সুরক্ষিত উড়ান। কলকাতা-কোচবিহার বা কলকাতা-আলিপুরদুয়ার নিয়মিত যাতায়াত করেন এমন কয়েকজন চিকিৎসকের কথায়, ভাই, জীবনের দামটা অনেক বেশি, ওই পাখি-বিমানে চড়তে যাব কেন বলুন? মন্ত্রীকে খুশি করতে? রাজনীতির লোকেদেরও একই কথা, ৫০ বা ৭০ আসনের বিমান নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, এত দিন অপেক্ষা করল এখানকার মানুষ, রানওয়ে বাড়ানোর জন্য আরও না হয় কিছুদিন ধৈর্য ধরা যেতেই পারে। তাঁদের মতে, এতে বিমান ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে আসবে, টিকিটের চাহিদাও বরাবর থাকবে।

পাখি-বিমান যদি করতেই হয়, অনেকে আবার মতামত দিলেন, তবে তা কলকাতা-মালদহ-কোচবিহার টুরিস্ট ফ্লাইট হিসেবে মরশুমে চালাতে পারেন। মালদার আম ও ইতিহাস থেকে কোচবিহারের রাজ-ঐতিহ্য, সেই সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বক্সা-জলদাপাড়া জুড়ে নতুন প্যাকেজ নামাতে পারে পর্যটন দপ্তর, এতে বাইরের ট্যুরিস্ট বাড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য এক প্রথিতযশা চিকিৎসকের তির্যক মন্তব্য, বিদেশি টুরিস্ট টানার আগে নিজেদের শহরের কদর্য হালের দিকে নজর ফেরান মশাই। মালদা বলুন বা কোচবিহার, কোনওটাই আর পাতে দেওয়ার অবস্থায় নেই যে !

নিজস্ব প্রতিনিধি

পাখি বিমান নিয়মিত হয়নি বহু চেষ্টাতেও, কোচবিহার বিমানবন্দর অপেক্ষায় রয়েছে কবে শুরু হবে সেই স্বপ্ন উড়ান !

মাত্র ০.৫ শতাংশ বনভূমির ভাগিদার তবু

বন বিভাগের মূল দুই দায়িত্ব কেন ফের কোচবিহারে ?

রাজ্যের বন দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া একটি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের মোট ১১,০৭৯ বর্গকিলোমিটার অরণ্যভূমির মধ্যে কোচবিহার জেলায় পড়েছে মাত্র ৫৭ বর্গকিলোমিটার। অথচ বিগত সরকারের মতো এবারও বন বিভাগের দু'টি বড় বড় পদই কোচবিহারের। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন মাথাভাঙা থেকে এবং বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ দিনহাটা থেকে নির্বাচিত বিধায়ক। বনমন্ত্রীর পদ কোচবিহারের কপালে জুটতে শুরু করেছে সেই বাম-আমল থেকেই। তৃণমূল সরকার আসার পর বনমন্ত্রী হন প্রথমে হিতেন বর্মন, তারপর বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে সরিয়ে বসানো হয় কোচবিহার নাটাবাড়ির রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। এবারও সেই ট্র্যাডিশন বজায় থাকায় প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের নানা মহলে— সুন্দরবনে না হয় আলাদা মন্ত্রক আছে, দার্জিলিং থেকে না হয় কেউ জেতেনি, ডুয়ার্স অর্থাৎ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার থেকেও কাউকে পাওয়া গেল না? নাকি তাঁদের যোগ্যতা কম? বাঁকুড়াই বা কী দোষ করল? বন দপ্তরের

বনভূমির বৃহদংশ যেসব জেলায়

২৪ পরগনা (উঃ ও দঃ)	৪,২২০ বর্গকিমি
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার	১,৭৮০ বর্গকিমি
মেদিনীপুর (পূঃ ও পঃ)	১,৭০৯ বর্গকিমি
দার্জিলিং	১,২০৪ বর্গকিমি
বাঁকুড়া	১,৪৮২ বর্গকিমি

জনৈক কর্তাব্যক্তির সহাস্য মন্তব্য, সত্যিই বনের দপ্তর চালানো আর মানুষের দপ্তর চালানো এক নয়, জ্ঞানগম্যি না থাকলে বন ও বন্য প্রাণ সমস্যার সমাধান করা যায় না। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর উদাহরণ ধরলে তো রাজ্যের বন দপ্তর দেখাশোনার জন্য সেইরকম জ্ঞানগম্যিওয়ালা লোক খুঁজে বার করতে হত মুখ্যমন্ত্রীকে!

রাজ্যের বনদপ্তরের শীর্ষ দুই পদ কোচবিহারের জনপ্রতিনিধিদের হাতে এবারও থেকে যাওয়ায় সবথেকে বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির মানুষ। কয়েকজন তৃণমূল নেতাও এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে বা নাম বলতে নারাজ। বিরোধীদের কথায়, 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে যিনি বেশি নির্ভর করেন সেই নেত্রীর কাছ থেকে এই ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত আশা করা অন্যায় নয়।'

নিজস্ব প্রতিনিধি

এবার পুজোর ছুটিতে উত্তরবঙ্গ থেকে কেরালা বেড়াতে চলুন

মোট ১৫ দিনের সফর

সামান্য কয়েকটি আসন খালি রয়েছে

07/10/16 Day 1: Start from NCB/NJP
08/10/16 Day2: In train
09/10/16 Day 3: Arrive at Kochi. Overnight hotel
10/10/16 Day 4: COCHIN
11/10/16 Day 5: MUNNAR
12/10/16 Day 6: MUNNAR
13/10/16 Day 7: THEKKADY
14/10/16 Day 8: ALLEPPEY **(House boat cost Extra)**
15/10/16 Day 9: KOVALAM
16/10/16 Day 10: Kovalam-Trivandram-Kovalam
17/10/16 Day 11: KANYAKUMARI
18/10/16 Day12: Trivandram Central for train
19/10/16 Day13: Train
20/10/16 DAY14: NJP/NCN. Tour Ends

HOLiDAYAAR

শিলিগুড়ি অফিস : হরেন মুখার্জি রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
Ph. : 0353-2527028 / 9735095957
E-mail : holidayaar.nb@gmail.com

দিনহাটা অফিস : শিতলাবাড়ী রোড, ওয়ার্ড নং-৫, দিনহাটা, কোচবিহার
M : 9434042969 / 9434442866

সংকটে মদনমোহন

শ্রীশ্রীমদনমোহনের দেশ কোচবিহার। কোচবিহারবাসীর আরাধ্য দেবতা প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীমদনমোহন। রাজ-আমলে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই কোচবিহারের ধর্মীয় বিষয়াদি আবর্তিত। রাজ-আমল থেকেই 'দেবত্র ট্রাস্ট রুলস' দ্বারা দেবত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিচালিত হয় 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড'-এর মাধ্যমে। কোচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি অনুযায়ী রাজতন্ত্র অবসানের পর দেবত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়ভার সরকারের। বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড রাজ্য সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অধীন। অথচ দেখা যাচ্ছে, মদনমোহন মন্দিরসহ অন্যান্য দেবত্র বিভাগের কাজকর্মে চলছে চরম অর্থসংকট। চলছে বাজেট ছাঁটাই। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনার আমদানি। অভিযোগ, পর্যটন দপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে বছর দেড়েক। সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। মদনমোহনদেবের মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার পর আবার কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে মন্দির পরিচালনকারী দেবত্র ট্রাস্ট। এই পরিস্থিতির দায় কোচবিহারের 'জনগণমন অধিনায়ক'রা কি এড়াতে পারেন? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী সব শুনে আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি বিষয়টি সরকারকে জানাবেন।

দেবত্র ট্রাস্টের আয় বাড়াতে এবার মন্দিরে জুতোয় কর

মদনমোহনের অনটন ঘোচাতে আশ্বাস মন্ত্রীর

কোচবিহার থেকে নির্বাচিত বিধায়ক মিহির গোস্বামী সমস্যার সমাধানে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তুলে দেন একটি আবেদনসহ প্রস্তাবপত্র। কোচবিহারবাসীর আবেগকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য তিনি পর্যটন মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। প্রস্তাব হিসেবে বলেন, দেবত্র ট্রাস্টের অধীনে বহু খালি জমি পড়ে আছে, সেখানে পিপিপি মডেলে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে ভবিষ্যতে আর্থিক সংকট মেটানো যেতে পারে। মিহিরবাবু একই সঙ্গে আবেদন পর্যটন সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে।

সৌজন্যে দেবব্রত চাকী

৩৬ কিমি ঝাঁ-চকচকে যে পথে আর কোনও পরিষেবা মেলে না!

ময়নাগুড়ি থেকে চালসা— ঝকঝকে ৩৬ কিলোমিটার চওড়া পথ পেরতে আধুনিক এসইউভি গাড়িতে সময় লাগে বড়জোর আধ ঘণ্টা। এ পথেই বিখ্যাত লাটাগুড়ির জঙ্গল তথা গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক। যতদিন তিস্তার নতুন ব্রিজ তৈরি হয়নি, ততদিন কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারের বাস শিলিগুড়ি থেকে আসত ঘুরপথে সেবক ব্রিজ, মালবাজার হয়ে এই লাটাগুড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়েই। জঙ্গলের পথ সে সময় ছিল ভীষণ সরু, মাঝেমধ্যেই গাড়িঘোড়া আটকে পড়ত হাতির পাল রাস্তা আটকে আড্ডা জমানোয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাতিরা জঙ্গলে নেমে গেলে আবার গাড়ি চলাচল শুরু হত। এখন সেইসব দিনকাল পালটে গিয়েছে— জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা চওড়া হয়েছে, যানবাহন বেড়েছে একশো গুণ। এখন হাতির পালকে কখনও সখনও রাস্তা পার হতে দেখা যায় দ্রুত সন্ত্রস্ত পায়ে। দ্রুত পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক ঘিরে। লাটাগুড়ি, বাতাবাড়ি, ধূপঝোরাতে চাষের জমি, জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠেছে ডজন ডজন রিসর্ট। খোলা জিপসি চেপে শয়ে শয়ে মানুষ ঢুকছে জঙ্গলে। ওয়াচটাওয়ারে চেপে বন্য পশুপাখি দেখার আনন্দ দিতে। বলাই বাহুল্য, গাছ কাটা ও কাঠের ব্যবসায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ আসার পর এইসব এলাকায় যে অর্থনৈতিক মন্দা এসেছিল, পর্যটন তার অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছে।

৩৬ কিলোমিটার এই পথে পড়ে বৌলবাড়ি, মওলানি, শিঙিমারি, লাটাগুড়ি, বাতাবাড়ি, মঙ্গলবাড়ির মতো গ্রাম, যেগুলি আজ আর গ্রাম নেই, জনসংখ্যার বিস্ফোরণে গঞ্জে পরিণত হয়েছে। ছত্রিশের মধ্যে আঠারো কিলোমিটার পথ জঙ্গল ও চা-বাগানের বিস্তৃতি থাকায় পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যা দক্ষিণবঙ্গ বা কলকাতা শহরের কাছে মূল ডুয়ার্স হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। প্রত্যেক মরশুমে পর্যটকের ভিড়ে জমজমাট থাকে এই পথ। কলকাতা থেকে পৌঁছাবার সবচেয়ে কাছাকাছি স্টেশন ময়নাগুড়ি ও মাল। গরম, পুজো বা শীতের ছুটি পড়লেই এই দুই স্টেশনের গুরুত্ব যেন হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। দলে দলে মানুষ ব্যাগবোঝাই হয়ে নামেন, তারপর ভাড়া করা গাড়িবোঝাই হয়ে পৌঁছে যান নানা সরকারি ও বেসরকারি রিসর্টে।

অথচ এই ৩৬ কিলোমিটার পথে কোনও পেট্রোল পাম্প নেই বললেই চলে (ক্রান্তি মোড় থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে অবশ্য একটি মেলে)। স্থানীয় মানুষরাই জানালেন, ৩৬ কিমি এই পথে ব্যাঙ্ক বা এটিএমের সংখ্যা হাতে গুনে গোটা তিন বা চার, আর সব ক'টিই যে চালু থাকবে, তারও কোনও গ্যারান্টি নেই। লাটাগুড়ি বেড়াতে এসে প্রায়শই দেখা যায়, টুরিস্টরা সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়েন ব্যাঙ্ক এটিএম নিয়ে। মাত্র একটি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এটিএম, যেটি মাঝেমধ্যেই অচল থাকে। পর্যটকরা আজকাল কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাশ টাকা নিয়ে বেড়াতে বেরন না। তাই অনেক সময়ই দেখা যায়, গাড়ি ভাড়া করে ২৪-২৫ কিমি দূরের মাল থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসতে। তাঁদের কথায়, এ পথে কোনও গ্রামের মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হলে, নিদেনপক্ষে হাত-পা ভাঙলে তাকে দৌড়াতে হবে মাল মহকুমা হাসপাতাল বা তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে। স্থানীয় ডাক্তার পাওয়া একরকম দুষ্কর। গ্রামীণ হাসপাতালগুলি নিয়ে তাঁদের মতে, কথা না বলাই যেমন ভাল। তেমনই পর্যটক বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা ইমার্জেন্সি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে কী হাল হতে পারে, তাও সহজেই অনুমেয়।
লাটাগুড়ি-বাতাবাড়ির বেশির ভাগ বাসিন্দা আরও একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। মাল থানার দূরত্ব লাটাগুড়ি থেকে ২৫ কিমি, ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িও ৮ কিমি। আবার বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা বা থানার অধীনে সেই মেটেলির দূরত্ব ১২-১৪ কিমি। তাঁদের কথা, স্থানীয় অপরাধ দমনই বলুন বা পর্যটকদের

> এই ৩৬ কিলোমিটার পথে কোনও পেট্রোল পাম্প নেই বললেই চলে (ক্রান্তি মোড় থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে অবশ্য একটি মেলে)। স্থানীয় মানুষরাই জানালেন, ৩৬ কিমি এই পথে ব্যাঙ্ক বা এটিএমের সংখ্যা হাতে গুনে গোটা তিন বা চার, আর সব ক'টিই যে চালু থাকবে, তারও কোনও গ্যারান্টি নেই।

নিরাপত্তা-সুরক্ষার কথাই বলুন, রাতবিরেতে অন্ধকার জঙ্গলের পথে এই মানুষকে আদৌ কতটা ভরসা জোগাতে পারে, সেটা একবার বিবেচনা করে দেখুন!

গত দশ-বারো বছর ধরে গোরুমারাকে ঘিরে পর্যটন জনপ্রিয় হওয়ায় ধূপঝোরা, রামসাই, লাটাগুড়িতে বহু টুরিস্ট লজ গড়ে উঠেছে— সব ক'টিই ঠিকঠাক ভালভাবে চলছে তা নয়, কিন্তু লাটাগুড়িকে ঘিরে যে একটি গুরুত্ব পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পথঘাট, বিদ্যুৎ বা পানীয় জল নিয়ে হয়ত কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ইত্যাদি পরিষেবা নিয়ে এখনও নজর দেয়নি সরকার। চালসার এক টুর অপারেটর জানালেন, পরিবহণব্যবস্থাও এ পথে অত্যন্ত দুর্বল। যেমন শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস দিনে সাকুল্যে তিনটি, ফেরার পথেও তা-ই। অথচ পর্যটকদের একটা বড় অংশ নিউ জলপাইগুড়িতে নামেন, আর তাঁদের ভরসা সেই ভাড়া গাড়ি। মাল-জলপাইগুড়ি রুটের বাস দিনভর চলে, কিন্তু সন্ধে সাতটার পর সব ভোঁ ভাঁ। ট্রেন লেট করলে বা ইন্টারসিটিতে চালসা বা ময়নাগুড়িতে নামলে এ পথের বাসিন্দাদের বাড়ি পৌঁছানো খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসার কাজে বা রুজিরোজগারের জন্য যাঁদের নিয়মিত একটু দেরি করেই ফিরতে হয়, তাঁদের কী অবস্থা হয় তা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় মানুষের মতে, সন্ধে সাতটার পরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা গোটা দুয়েক বাস অন্তত রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা অব্দি এ পথে চালালে স্থানীয় মানুষের আস্থা আরও বাড়ত।

তেমনই শিলিগুড়ি যাতায়াতের জন্য গোটা দুয়েক বাস সকালে এবং গোটা দুয়েক বিকেলে চললে কেবল সাধারণ মানুষেরই নয়, পর্যটকদেরও অনেকটা সুরাহা হত। তাঁদের মতে, এ কাজ কঠিন কিছু নয় বা জটিল ফাইল নাড়াঘাঁটার কোনও ব্যাপার নেই, বাস বা বাসকর্মীরও অভাব নেই, প্রয়োজন কেবল রাষ্ট্রীয় পরিবহণের উপরওয়ালাদের একটি ছোট্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের।

এসব কিছুর পরেও আশা ছাড়তে নারাজ এখানকার মানুষ। এখন কোচবিহার থেকে সকালের ট্রেনে চেপে দুপুরে পৌঁছে যাওয়া যায় লাটাগুড়ি। কোচবিহার, মাথাভাঙা, চ্যাংড়াবান্ধা, জামালদহর মানুষ দিনভর জঙ্গল দেখে সে দিনই বা পরদিন সন্ধের ট্রেনে চেপে ফিরতে পারবেন ঘর। যাতায়াতের খরচ অতি সামান্য। লাটাগুড়ি এলাকার মানুষের বিশ্বাস, ট্রেন চলাচল এ পথে আরও বাড়বে, আর যাতায়াত সুগম হলেই বাকি সব সুবিধা চলে আসবে হাতের নাগালে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

এই পথেই ট্যুরিস্টের চোখে পড়েছে বেশ কিছু সোলার প্যানেল, অথচ কাজ করছে মাত্র একটি

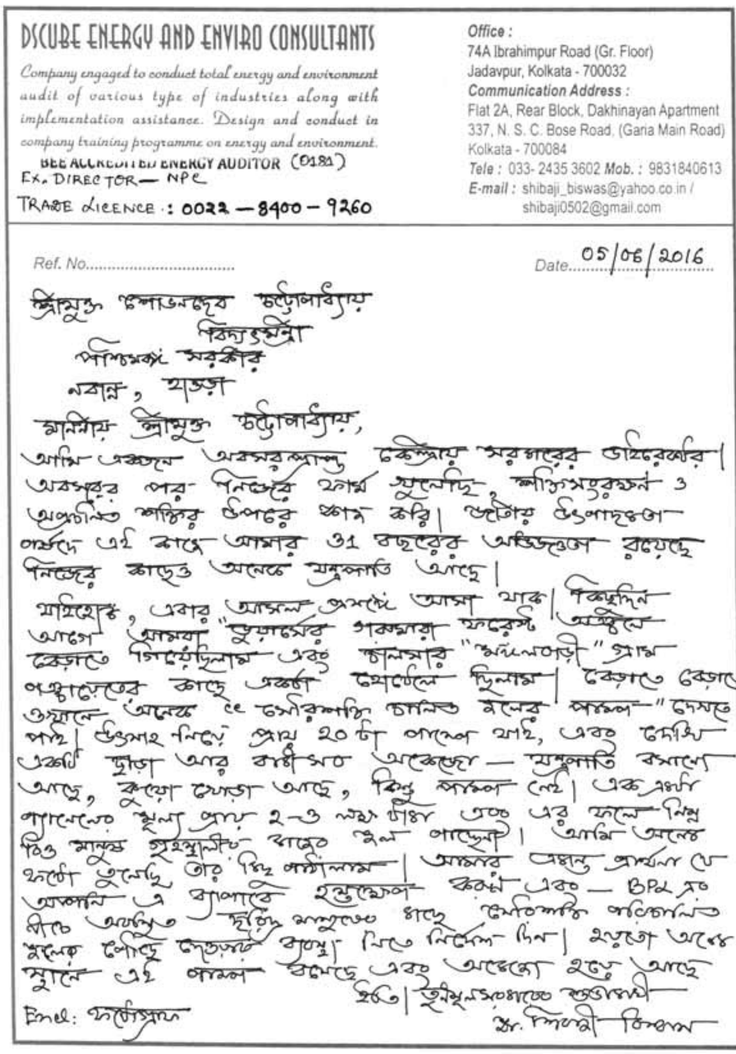

DSCUBE ENERGY AND ENVIRO CONSULTANTS

Company engaged to conduct total energy and environment audit of various type of industries along with implementation assistance. Design and conduct in company training programme on energy and environment.

BEE ACCREDITED ENERGY AUDITOR (0181)
EX. DIRECTOR — NPC
TRADE LICENCE : 0022 — 8400 — 9260

Office :
74A Ibrahimpur Road (Gr. Floor)
Jadavpur, Kolkata - 700032
Communication Address :
Flat 2A, Rear Block, Dakhinayan Apartment
337, N. S. C. Bose Road, (Garia Main Road)
Kolkata - 700084
Tele : 033- 2435 3602 Mob. : 9831840613
E-mail : shibaji_biswas@yahoo.co.in /
shibaji0502@gmail.com

Ref. No...............................

Date 05/06/2016

শ্রীযুক্ত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যুৎমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

মাননীয় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়,

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেক্টর। অবসরের পর নিজের ফার্ম খুলেছি, শক্তিসংরক্ষণ ও অপ্রচলিত শক্তির উপরে কাজ করি। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পর্ষদে এই কাজে আমার 31 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে নিজের কাছেও অনেক যন্ত্রপাতি আছে।

যাইহোক, এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। কিছুদিন আগে আমরা "ডুয়ার্সের গরুমারা ফরেস্ট" অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং চালসার "মঙ্গলবাড়ী" গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে একটা হোটেলে ছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে ওখানে অনেক "সৌরশক্তি চালিত নলের পাম্প" দেখতে পাই। উৎসাহ নিয়ে প্রায় 20টা পাম্পে যাই, এবং দেখি একটি ছাড়া আর বাকী সব অকেজো — যন্ত্রপাতি বসানো আছে, কুয়ো খোঁড়া আছে, কিন্তু পাম্প নেই। এক একটি প্যানেলের মূল্য প্রায় 2-3 লক্ষ টাকা হবে এর ফলে নিম্ন বিত্ত মানুষ [illegible] জল পাচ্ছেন। আমি অনেক ফটো তুলেছি, তার কিছু পাঠালাম। আমার বিনীত প্রার্থনা যে আপনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন এবং — BPL [illegible] সৌরশক্তি পরিচালিত [illegible] মূলক পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিন। হয়তো অনেক স্থানে এই পাম্প বসেছে এবং অকেজো হয়ে আছে।

ইতি। শুভেচ্ছাসহ [illegible]
ডঃ শিবাজী বিশ্বাস

Encl: ফটোগ্রাফ

সম্প্রতি ডুয়ার্স বেড়াতে এসে মঙ্গলবাড়ির একটি ইকো রিসর্টে উঠেছিলেন কলকাতার ড. শিবাজী বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর শিবাজীবাবু অপ্রচলিত শক্তি নিয়ে বহুদিন কাজ করে আসছেন। এখনও ওনার নিজস্ব ফার্ম রয়েছে। বেড়াতে এসে রিসর্টের কাছে মাঠের মধ্যে বেশ কয়েকটি সোলার প্যানেল দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। ডুয়ার্স প্রান্তে সোলার প্যানেল বসাতে মানুষের উৎসাহ যাচাই করতে যান তিনি। কিন্তু কাছে যেতেই তাঁর ভুল ভেঙে যায়, তিনি দেখেন একটি বাদে বাকি সবক'টিই অকেজো। তাঁর মতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও বহু জায়গায় এভাবে সোলার প্যানেল বসিয়ে অকেজো রেখে অর্থের অপচয় হচ্ছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে গত ৫ জুন তিনি একটি চিঠি লেখেন। এখনও উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার বাসনায় তিনি সেই চিঠির একটি প্রতিলিপি ও অকেজো সোলার প্যানেলের ছবি পত্রিকা দপ্তরে সম্প্রতি মেল করেন।

খেলার মাঠে নিরলস কারিগর বালুরঘাটের গৌতম

বালুরঘাট হাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই খেলাধুলোর প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি যে খেলার মাঠে একটা কিছু ঘটাবেন, সেটাও বোঝা গিয়েছিল। অবাক হতে হয়, বালুরঘাটের মতো একটি মফস্‌সল শহরে থেকেও খেলাধুলোর প্রতি তাঁর তীব্র প্যাশন। আর যার দরুন রাজ্যের ক্রীড়া মানচিত্রে বালুরঘাটসহ সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুরের উত্তরণ। ক্রীড়া পরিকাঠামোর দৌলতে বালুরঘাটসহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এখন রাজ্যের ক্রীড়াদুনিয়ায় এক আলোচিত নাম।

ক্রিকেট আয়োজনের প্রসঙ্গেও উঠে আসবে বালুরঘাটের কথা। হ্যাঁ, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের কথা মাথায় রেখেও বলছি। কী নেই সেখানে? একটা প্রমাণ সাইজের মাঠ, ছ'টি ক্রিকেট পিচ, মাল্টিজিম, পৃথক ড্রেসিং রুম, কনফারেন্স রুম, খেলোয়াড়দের জন্য এসি ডর্মিটরি, বর্ষার সময়েও ক্রিকেট প্র্যাকটিসের সুব্যবস্থা— আর কী চাই! মাঠ দেখলে মনে হবে যেন কেউ সবুজ গালিচা পেতে রেখেছে। সুদৃশ্য গ্যালারি থেকে গেট— সবকিছুতেই পরিশীলিত রুচির ছাপ স্পষ্ট। খেলার মাঠকে কতটা আপন করে নিলে এমনভাবে ভাবা যায়— উজ্জ্বল উদাহরণ বালুরঘাট স্টেডিয়াম।

একদিকে তৈরি হচ্ছে ইনডোর স্টেডিয়াম আর চলছে স্বপ্ন দেখা। যিনি নিজে স্বপ্ন দেখছেন আর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আপামর দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীকে, তিনি গৌতম গোস্বামী। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ছোট্ট শিশুরা তাঁর স্নেহে, আন্তরিকতায় বেড়ে উঠছে। খেলার মাঠও তাঁর আরেক সন্তান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক গৌতম গোস্বামী জানান, 'আমাকে খেলার মাঠে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল পিনাকী চক্রবর্তী। তখন আমরা ক'জন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পরে অবশ্য বালুরঘাট টাউন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হই।' স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয়, কেন এলেন আর সেটা কীভাবে?— 'এ যেন কুহকের টান। এটা নিশ্চিতই ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে আমি বলব সমাজসেবী বিমল সরকারের কথা, যিনি প্রথম বলেছিলেন, আমাকে অন্য সবকিছু ছেড়ে খেলার মাঠের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। সমাজসেবী শিশির ঘোষ আমাকে

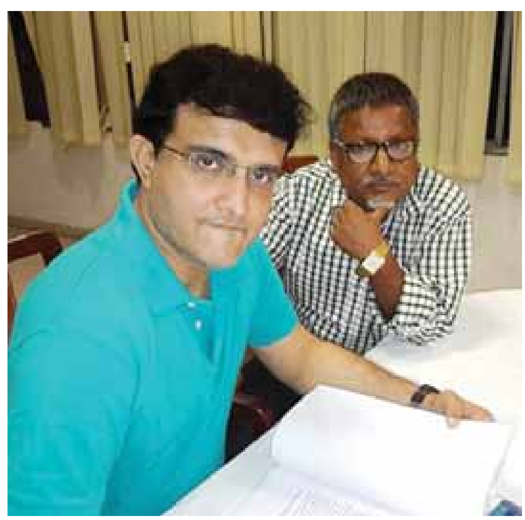

মহারাজ গৌতমের জীবনে সর্বোচ্চ প্রেরণা, তাঁকে বালুরঘাটে শীঘ্রই নিয়ে আসার কথা ভাবছেন এই ক্রীড়াকর্মী।

ঘোর বর্ষাতেও বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ক্রিকেটের নেট প্র্যাকটিস চলে একই ছন্দে। বাকি সময় ছাউনির নিচে অন্যান্য খেলাও।

স্টেডিয়ামের পাশেই জোর কদমে চলছে আধুনিক ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির কাজ। দক্ষিণ দিনাজপুরের মুকুটে নতুন পালক।

শিখিয়েছিলেন বালুরঘাটসহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে সবার উপরে তুলে ধরতে বা নতুন কিছু করতে। আর ক্রীড়া সংগঠক অরূপ ভট্টাচার্য কলকাতার ময়দানে প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত ধরে পরিচয় করিয়েছিলেন। এঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।' আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন গৌতম, 'ক্রিকেট খেলার এমন পরিকাঠামো কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই।'

শুধু ক্রিকেট?— 'না না, শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স, সাইক্লিং— জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক হিসেবে সব দিকেই নজর দিচ্ছি। গড়গড় করে বলে যেতে থাকেন গৌতম, ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবি পাড়ায় কেআইটিএম-এর সহযোগিতায় গ্রাসরুট লেভেল ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করছি। কারণ, গ্রামেও প্রচুর প্রতিভা আছে। ভলিবলে ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে, সাইক্লিস্ট সুজন কর্মকার জাতীয় দলে ছাপ রেখেছে, অ্যাথলেটিক্সে রাজ্যসেরা হয়েছি আমরা।' গৌতমের আত্মবিশ্বাসী জবাব শেষ হওয়ামাত্র প্রশ্ন, শহরের নতুন প্রজন্ম কি ফুটবল খেলছে?— 'ঠিকই, এই সমস্যাটা আছে। ফুটবল খেলাটা এখন গ্রামেই হয়। শহরের ছেলেরা আর আগের মতো খেলে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভাবনা দুটো। এক, গ্রামেও ফুটবল লিগের ম্যাচ দেওয়া, যাতে ওরা আরও উৎসাহিত হয়। আবার শহরেও খেলা চালু করছি, যাতে নতুন করে আগ্রহ বাড়ে।' সেটা কীরকম?— 'এই যেমন শহরের মাঝখানে বহুদিন অব্যবহৃত থাকা ফ্রেন্ডস' ইউনিয়নে আবার খেলা চালু করলাম। আমরা চাইছি টোটাল এক্সপ্যানশন। আশা করি, ফল মিলবেই।' আশাবাদী গৌতমকে বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, এত এনার্জি আসে কোত্থেকে? খেলার মাঠই ধ্যানজ্ঞান, নিরন্তর উদ্যোগ, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বালুরঘাট থেকে জেলাকে খেলার মানচিত্রে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সদাসর্বদা প্রচেষ্টা। এটুকুই কি সব? গৌতম বললেন, 'আসলে যে সময়ে আমরা বড় হয়েছি, সেখান থেকেই বীজটা বোধহয় বোনা হয়েছে। ভবানী ঘোষের চায়ের দোকান তখন আমাদের কফি হাউস, আড্ডা দিচ্ছি দেদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে মজে থাকছি, বিবর্ণ মুখোশ পত্রিকা বার করছি আমরা। আর্জেন্তিনার খেলা হলে মেতে উঠছি... সে এক সময় বটে! প্রথমে আম্পায়ারিং-এর মাধ্যমে খেলার মাঠে আসি। তারপর এনার্জি পেয়েছিলাম বিকাশ (তিলক) চৌধুরীর উদ্যোগ দেখে। আমাকে উনি ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছেন।'

ক্রীড়া উদ্যোগী গৌতম যেমন ছুটোছুটি করেন, তেমন কথাও বলেন অনর্গল। প্রসঙ্গ

পালটে বললাম, শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন?— ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ক্রিকেট প্রশাসনে আসার পর বাংলার ক্রিকেটারদের জন্য ভিশন ২০২০ চালু করছেন। তাতে যুক্ত হয়েছেন ওয়াকার ইউনিস, মুথাইয়া মুরলীধরন, ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রমুখ। তারই অঙ্গ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় বাংলা দল নিয়ে গিয়েছিলাম।’ জানালেন ওয়েস্টবেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের সমগ্র উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম সম্পাদক গৌতম গোস্বামী। সৌরভের সাহায্য কেমন পাচ্ছেন?— ‘অভাবনীয়। সৌরভের কী স্বচ্ছ ভাবনা! দূরদৃষ্টি প্রচণ্ড। প্রতিটি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে সমস্তরকম সাহায্য দেবেন, স্পনসর জোগাড় করে দেবেন বলেছেন। আমরা নতুনভাবে স্বপ্ন দেখছি। বালুরঘাটে সৌরভকে একবার নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।’ আর স্থানীয় সহযোগিতা? একটু ভেবে গৌতম বললেন, ‘১৯৯৩-এ যুক্ত হই। ১৯৯৭-এ কার্যকরী সম্পাদক হই। পুরোপুরি দায়িত্ব পাই ১৯৯৯ সালে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, ক্লাবগুলির দারুণ সাহায্য পেয়েছি। কল্যাণ (দখাই) বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব (লালু) দাস বিভিন্নভাবে দারুণ সহযোগিতা করেছে। আমরা রাজ্যে জেলা ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নও হয়েছি। সেই টিমের সোমনাথ সাহা রাজ্যে সেরা বোলার হয়েছে। সোমনাথ ছাড়াও মানস, জয়দেব, ডোডো, ব্রতসহ সবার সহযোগিতা পাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমান কোচদের, সাপোর্ট স্টাফ, কমিটি— সবার দারুণ সহযোগিতা পাচ্ছি।’

গৌতমের আগামী ভাবনা বা পরিকল্পনা নিয়ে কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। সে প্রসঙ্গ নিজেই পেড়ে ফেললেন— জেলায় মহিলা ফুটবল। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে গ্রুপ অব কোচেস। সুইমিং পুল নির্মাণ। আরও অত্যাধুনিক জল নিকাশি ব্যবস্থা। জাতীয় স্তরের গোলকিপার বালুরঘাটের অভিজিৎ মণ্ডলকে সামনে রেখে কুশমান্ডিতে ফুটবল আকাদেমি। এর পর আর কোনও আক্ষেপ?

একটু চুপ থেকে বললেন, ‘সুরজিৎ, সুমিত— এরা কলকাতার টিমগুলোতে খেলছে। কিন্তু আরও ভাল মানের প্লেয়ার তুলতে চাই, যারা রাজ্য ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। ক্লাবগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। সাড়াজাগানো প্লেয়ার তুলতে পারছি না— এইটা আক্ষেপ।’

‘পরিকাঠামোগত সমস্যা থাকলেও আগামী বছরের মধ্যে বিসিসিআই-এর যে কোনও পর্যায়ের ম্যাচ আমি আয়োজন করবই। এটা আমার লক্ষ্য।’ ছোটখাটো বলিষ্ঠ চেহারার গৌতম গোস্বামীর দৃঢ়প্রত্যয়ী চোখে তখন সেইসব স্বপ্নই উঁকি দিচ্ছিল।

সবুজ মিত্র

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স

মোহিনীগঞ্জের তুলাইপাঞ্জি বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে

উত্তর দিনাজপুর জেলার নিজস্ব ধান তুলাইপাঞ্জির খ্যাতি জগৎজোড়া তার স্বাদ আর সুগন্ধের কারণে। এতকাল ওই ধানের চাষ হত মূলত জেলার রায়গঞ্জ ব্লকে। কিন্তু ভিন রাজ্য ও দেশে তার চাহিদা বাড়ায় চাষের আগ্রহ বেড়েছে কৃষকদের মধ্যে। তাই অন্য ধান চাষের চেয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় এখন বিঘার পর বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি। জেলা ছাড়িয়ে যখন সুগন্ধি তুলাইপাঞ্জি পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে, তখন জেলার একটিমাত্র জায়গায় এই ধানের চাষ হবে কেন? কম খরচে অধিক লাভের আশায় উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই ধানের চাষ শুরু হয়েছে জোর কদমে। কালিয়াগঞ্জ ব্লকে বিঘার পর বিঘা জমিতেও হচ্ছে তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের কৃষি আধিকারিক জানান, রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনার অন্তর্গত উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার ও রায়গঞ্জে এই তুলাইপাঞ্জি চালের বীজ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে কৃষকদের মধ্যে। জেলার চারটি ব্লকে মোট ৩০০ হেক্টর জমিতে এই তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ হচ্ছে। অন্য দিকে, কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সহ-কৃষি অধিকর্তা সঞ্জয় সাহা জানান, কয়েক বছর আগে এই তুলাইপাঞ্জি ধান শুধুমাত্র রায়গঞ্জ ব্লকের মোহিনীগঞ্জেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভাণ্ডার, মোস্তাফানগর, অনন্তপুর, বরুণা ও মালগাঁও গ্রামের বহু কৃষক এই ধান চাষের প্রতি মন দিয়েছে।

তুলাইপাঞ্জি চাষে কৃষকরা যাতে বেশি করে মনোযোগী হয়, তার জন্য কৃষি দপ্তর থেকে নানাভাবে সহযোগিতাও দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের বক্তব্য, অন্য ধানের চেয়ে এই ধান চাষের খরচ অনেক কম। এ ছাড়া পাট কাটার পর একমাত্র তুলাইপাঞ্জি চাষ করেই কম সময়ে অধিক ফলন পাওয়া যায়। কৃষকরা এ কথাও বলেন, এই চালের স্বাদ ও গন্ধ এমনই, যে এই চাল একবার খায়, সে আর অন্য চালের স্বাদ নিতে চায় না। ফলে তুলাইপাঞ্জির চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদা শুধুমাত্র জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, জেলা ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে তুলাইপাঞ্জি। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর জানাল, বাসমতী চালের মতো এই চালকে পেটেন্টের আওতায় আনার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুরনো অনেকরকম ধানের চাষই আর হয় না উত্তরবঙ্গের জমিতে। বিশেষ করে ধান

উৎপাদনের জন্য এ তল্লাটে যে দুই জেলার সব থেকে বেশি খ্যাতি, সেই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের চাষিরাও সে চাষ ভুলতে বসেছে। টিকে আছে শুধুমাত্র তুলাইপাঞ্জি। দক্ষিণে যেমন চাষ বেড়েছে কাটারিভোগ ধানের, তেমনটা কিন্তু উত্তরের তুলাইপাঞ্জি সম্পর্কে বলা যায় না। মাঝে তো সরকারি উদ্যোগের অভাবে বন্ধই হতে বসেছিল এই ধানের উৎপাদন। এখন আবার নড়েচড়ে বসেছে সরকার। সূত্রে খবর, এ বছর উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫৯৪০ হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ করেছে কৃষকরা। সরকারিভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২,০০০ মেট্রিক টন।

উল্লেখ্য, তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ দুই দিনাজপুর জুড়ে হলেও রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদ ব্লকে (উত্তর দিনাজপুর) তা সব থেকে ভালো হয়। আবার এর মধ্যেও উৎকৃষ্টমানের তুলাইপাঞ্জি চাষ হয় রায়গঞ্জ ব্লকের রুনিয়া ও জগদীশপুর মৌজায়। বহু ধান এখন আর চোখ না পড়লেও তুলাই কিংবা কাটারিভোগ চাল বেঁচে থাকার কারণ হল, পাট কেটে নেবার পর কৃষকের তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না অতীতে। এখনও সেই ধারা অব্যাহত। আলোক সংবেদনশীল এই তুলাইপাঞ্জির উৎপাদনপদ্ধতিকে আরও উন্নত করা, তাকে সংরক্ষণের যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল তা কিন্তু নেয়নি সরকার। তাই একসময় তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ বন্ধই হতে বসেছিল। হেমতাবাদ ব্লকের কৃষি অধিকর্তা শ্রীকান্ত সিনহার মতে, তুলাই ধান চাষ এখন হচ্ছে গোটা ব্লক জুড়েই। এবার হেমতাবাদ ব্লকে ১,২৫০ হেক্টর জমিতে তুলাইয়ের চাষ হয়েছে।

তবে সর্বত্র তুলাইয়ের গুণগতমান একরকম নয়। রায়গঞ্জ ব্লকের রুনির ও জগদীশপুর— এই দুই মৌজায় কেন তুলাইপাঞ্জি ধান সবচেয়ে ভাল হয়, তার সঠিক কোনও কারণ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। রায়গঞ্জ কৃষি ফার্ম অধিকর্তা শক্তি মঙ্গল জানান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কৃষিবিজ্ঞানী ড. গৌতম মণ্ডল এবং ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ-সহ আরও কয়েকজন কৃষিবিজ্ঞানী নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন, যাতে তুলাইপাঞ্জি বীজের মানোন্নয়ন ঘটে। ২০০৭ সালে যে তুলাইপাঞ্জি চালের দাম ৩০-৪০ টাকা ছিল, এখন সেই তুলাই ৮০-১০০ টাকা প্রতি কেজি। রায়গঞ্জ ব্লকের মতো কালিয়াগঞ্জের কুনোর মৌজায় উৎপাদিত তুলাইয়ের মান ভাল। তবে কুনোরের তুলাইয়ের এখনও তেমন পরিচয় ঘটেনি। তুলাইপাঞ্জির মতো প্রায় একই রকমের আরেকটি ধান হল এলাই। এর সুগন্ধ নেই। আকারে তুলনামূলক সামান্য মোটা। ভাল তুলাই চালের সঙ্গে এই এলাই চাল অনেক সময় মেশানো হয় পরিমাণ বাড়াতে।

সাধারণ ধানের থেকে ফল কম হয় তুলাই ধানের। সাধারণ উচ্চফলনশীল ধানের তুলনায় ফলনও অনেক কম। চাল তৈরির ক্ষেত্রেও একই পার্থক্য। এক কুইন্টাল ধান থেকে মাত্র ৫০-৫৪ কেজি চাল পাওয়া যায়। লাভ হয় শুধু ভাল দাম পাওয়া যায় বলেই। অন্য ধান, যেমন স্বর্ণ বা মিনিকেটের ক্ষেত্রে এক কুইন্টালে ৭৫-৮০ কেজি চাল হয়। শক্তিবাবু জানান, সাধারণত ১৫ অগাস্টের পরে তুলাই চাষ শুরু হয়। কিন্তু তার আগেও যদি চাষ করা যায়, তবে ফলন বাড়ে। আবার বেশি মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে ফলন বাড়লেও সুগন্ধে ঘাটতি থেকে যায়।

কিন্তু ফলন বাড়ানোর আগে দরকার বড় বাজার। উৎপাদনের পর বিক্রির জন্য কৃষকের সামনে বড় বাজার যতদিন না আসবে, ততদিন তুলাইপাঞ্জি ধান চাষে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসবে না কৃষকরা। এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চাই প্রচার। উত্তর বা দক্ষিণ দিনাজপুরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন বিভিন্ন কাজে। ফিরে যাবার সময় তুলাইপাঞ্জি কিনে নিয়ে যান দোকান থেকে। মোহিনীগঞ্জে তুলাইপাঞ্জির বড় বাজার রয়েছে। সেই বাজারের আধুনিকীকরণ করা দরকার। দুই জেলার প্রাণকেন্দ্রগুলিতে তুলাই, কাটারিভোগ, চিনি আতপজাতীয় চাল বিক্রির বাজার স্থায়ী ও একক হওয়া দরকার, যেখানে অনায়াসে পৌঁছাতে পারবেন ক্রেতারা। ভাল চাল তৈরির পর বড় বাজার সামনে থাকলে কৃষকরা তুলাই চাষে যে আগ্রহী হবেই— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এসবের জন্য চাই পূর্ণ সরকারি সহযোগিতা। উন্নতমানের দেশীয় ধানের এই সম্ভাবনাময় সম্পদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ চাষির হাত থেকে ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেবার আগে পর্যন্ত চাই উন্নত পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন।

তুলাই চাষের জন্য বহু জমি থাকলেও সেখানে চাষ হয় না। কারণ পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও সচেতনতার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে ঘাটতি রয়েছে। উচ্চফলনশীল বিজ্ঞানসম্মত ধানের ক্রমাগত বাজার দখলের লড়াইয়ে তুলাই তার ভারসাম্য যে ধরে রাখতে পেরেছে— এটাই সুখের। বিদেশের বাজারেও তুলাই যাচ্ছে। কত পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে তা অবশ্য কৃষি দপ্তর সূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে রূপসী তুলাই, সুমিষ্ট পরমান্নের স্বাদে ভরপুর তুলাই, দিনাজপুরের ধান চাষের আদি তুলাই বিশ্ব দরবারে কেন রানির আসনে বসবে না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

তন্ময় চক্রবর্তী

সাদিকুলের ‘মিনি মিউজিয়াম’ ঘরেই বন্দি থাকবে?

মোগল আমলের স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা থেকে শুরু করে গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রাসহ বিশ্বের ১৮৪টি দেশের মুদ্রা, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ৬০০ রকমের ডাকটিকিট, ২১০ রকমের তাস, দেশি-বিদেশি ২,৭৪০ রকমের দেশলাই, ব্রিটিশ আমলের দলিল, প্রাচীন যুগের পাথরে খোদাই করা কারুকার্য, সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোরান, ব্রিটিশ সরকারের বাটখারা, পুরনো দিনের কয়েকশো আতরদানি, হরিণের সিং, রুই মাছের বিশালাকৃতি আঁশ, পকেটঘড়ি, প্রাচীন যুগের ক্যালেন্ডার, ত্রুটিপূর্ণ ১০ টাকার নোট, ১৫ অগাস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আসাম রেলের টিকিট পরীক্ষকদের জামায় ঝোলানো পিন, এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন— তাঁর সংগ্রহের তালিকাটা যথেষ্টই দীর্ঘ।

প্রাচীন আমলের বহু বিরল জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতেই আস্ত একটি মিনি মিউজিয়াম তৈরি করে ফেলেছেন বছর সত্তরের সাদিকুল ইসলাম। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সাদিকুল ইসলামের এ এক অদ্ভুত নেশা। প্রায় নিঃশব্দে তিনি এই সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন। প্রচারবিমুখ প্রাথমিক শিক্ষক কিন্তু তাঁর এই মূল্যবান সংগ্রহশালা সংরক্ষণের জন্য পাননি ন্যূনতম সরকারি সাহায্য।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের চার মেয়ে ও দুই ছেলে। বাবা কুতুবুদ্দিন শেখ ছিলেন পেশায় রাজমিস্ত্রি। ইংরেজবাজার শহরের মহেশ মাটি ডাহা মোড় এলাকার একটি ছোট্ট ঘরে কোনওরকমে জীবনযাপন করেন সাদিকুল। ১৯৮৭ সালে কালিয়াচক নয়া গ্রামের হাজি ইব্রাহিম স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে বছর দশ আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জামাইবাবু সাদেক আলির নেশা ছিল প্রাচীন মুদ্রাসহ বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণ করা। দেশভাগের পর সাদেক আলি বাংলাদেশে

চলে যান। তাঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি বাংলাদেশ সরকার রাজশাহি মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে। জামাইবাবুর পথ অনুসরণ করে মাত্র সাত বছর বয়স থেকে অমূল্য জিনিস সংগ্রহে মেতে ওঠেন সাদিকুল।

সাত বছর বয়সে দেশলাই ও কয়েকটি বই সংগ্রহ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহের নেশাও বাড়তে থাকে। শিক্ষকতা করাকালীন দুর্লভ মুদ্রাসহ বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ শুরু হয়, তার সঙ্গে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ভ্রমণ। কখনও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, কখনও ভিন রাজ্যে, আবার কখনও দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও পাড়ি দেন। সেখান থেকেই সংগ্রহের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। সংগ্রহের নেশায় মত্ত হয়ে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, সিকিম, বিহার, ঝাড়খণ্ড ছাড়িয়ে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ভ্রমণ করেও দুর্লভ সম্ভার সংগ্রহ করেন।

কখনও আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীরাও কোনও দুর্লভ জিনিস পেলে সাদিকুলকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই তাঁর মিনি মিউজিয়াম দিনে দিনে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এলাকার লোকজন, বন্ধু, ছাত্রছাত্রীরা মিনি মিউজিয়াম দেখতে মাঝে মাঝেই ভিড় জমায়। আর সাদিকুল সাহেব অতি উৎসাহের সঙ্গে সকলকে তাঁর সংগ্রহ দেখান ও ব্যাখ্যা করেন। মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ডাক আসে জেলা ও ভিন জেলা থেকে। কিন্তু এত বিপুল সম্ভার বয়ে নিয়ে যাওয়াও সমস্যা। তাই এখন আর প্রদর্শনীতে যোগ দেন না। এখন নেশা একটাই, আরও বেশি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার।

সম্রাট কণিষ্ক, আওরঙ্গজেব, রাজিয়া সুলতানার সময়কালের মুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরে খুশি সাদিকুল। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের অ্যাজিলিসেস মুদ্রা সংগ্রহ করে তিনি এতটাই আনন্দিত হন যে, বন্ধুবান্ধবদের সে দিন খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন নিজ খরচে। মালদা জেলা প্রশাসনের কাছে তাঁর আবেদন এক চিলতে জায়গা, যেখানে সর্বসাধারণের জন্য ঐতিহাসিক জাদুঘর গড়ে তুলবেন, যেখানে তাঁর সংগ্রহের সমস্ত জিনিস সংরক্ষিত থাকবে। রাজ্য সরকারের কাছেও তাঁর একটাই আর্জি, দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলি সংরক্ষণে যাতে সাহায্য মেলে। কিন্তু কবে তাঁর বিনীত আবেদনে সাড়া দেবে প্রশাসন?

মানস দাস

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙ্গা পৌরসভা

কমপ্যাক্টর গাড়ি পাওয়া গিয়েছে

৮ নং ওয়ার্ডে হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙ্গা পৌরসভার নতুন কিছু প্রকল্প

মাথাভাঙ্গা মাছবাজারের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

হাইড্রেন প্রকল্পে ৮ নং ওয়ার্ডে শিবশংকর সা-এর বাড়ি (মনমোহন পাড়া) থেকে শুরু হয়ে কেষ্ট সাহার বাড়ি পর্যন্ত ২৬৫ মিটার লম্বা (চওড়া ৪ মিটার) হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা।

রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপ্যাক্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯ নম্বর ওয়ার্ডে (কলেজ মোড়) একটি ম্যারেজ হল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক আরও জানিয়েছেন—

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে রাজ্য সরকারের তরফে দেড় কোটি টাকার অনুদানে নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার চলছে।

আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ চলছে।

চন্দন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান

এছাড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও শিবমন্দিরের সংস্কারের কাজ শেষ।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা—

নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।

বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।

চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন।

মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।

বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।

দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নে ভেঙে পড়া পৌর-ব্যবস্থাকে সীমিত সামর্থের মধ্যে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাথাভাঙ্গা পৌরসভা।

শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নগরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই প্রথম একজন স্থায়ী চিকিৎসক ডা. অভিজিৎ সিনহাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও একজন স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টর এবং একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে ৬৩টি পাকা ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া 'আরবান পুওর' প্রকল্পে ২৪টি ঘর নির্মাণ করে প্রাপকদের প্রদান করা হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। খরচ ২.৮৭কোটি টাকা।

লক্ষপতি প্রামাণিক, চেয়ারম্যান

মাথাভাঙ্গা পৌরসভা

দেবপ্রসাদ রায়

দলীয় রাজনীতিতে গোষ্ঠী আর তাদের দ্বন্দ্ব শুরু থেকেই ছিল। জাতীয় স্তরের দলে হয়ত একটু বেশি মাত্রাতেই। প্রবীণ নেতা-কর্মীরা সাম্প্রতিক হাল দেখে হয়ত তাঁদের সময়কার ঘটনাবস্তু উলটেপালটে দেখেন। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন রাজনীতির লবি গঠন প্রসঙ্গটা উঠে এসেছে এই জীবনী আলেখ্যতেও। তবে সেসব ঘটনা কেবল দলীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ নয়, বরং রাজনৈতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি। বিশেষ করে গত শতকের সাতের দশকে বাম-অতিবাম শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের অবস্থান ও রাজনীতিচর্চার প্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে অন্যতম শাসকদেরও মনোভাব আসলে সময়কেই স্পষ্ট করে তোলে।

১৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তাকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যে ভাবাবেগের জোয়ার না এলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ধারা কোন পথে প্রবাহিত হত, তা একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। পশ্চিমবঙ্গ যে আরেকটা মালখান গিরি কিংবা বিজয়ওয়াড়া হয়ে উঠত না, সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু একটা যুদ্ধ গোটা পরিস্থিতিটাই বদলে দিতে পেরেছিল।

এর মধ্যে '৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতন এবং ১৭ মার্চ সাঁইবাড়িতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে সিপিএম। ছেলেকে হত্যা করে তার রক্ত ভাতের সঙ্গে মেখে মা-কে খাওয়ানো হয়েছিল সাঁইবাড়িতে। এইসব ঘটনার কারণে রাজ্য রাজনীতিতে ছাত্র পরিষদ প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পেতে শুরু করেছিল আবার। সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছিল তখন, তেমনই আবার নকশালদের সঙ্গেও প্রবল আদর্শগত সংঘাত। মনে পড়ে যে, আমি তখন 'দেশহিতৈষী' পড়ে নকশালের এবং 'দেশব্রতী' পড়ে সিপিএমের সমালোচনা করতাম নিয়মিত। আমাদের নিজেদের কোনও মুখপত্র না থাকায় দুই বিপক্ষের দু'টি মুখপত্র থেকেই গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হত। যা-ই হোক, ছাত্র পরিষদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ওই সময়টা থেকেই ফিরে আসতে শুরু করেছিল।

কিন্তু ততদিনে বুঝে গেছি যে, আমার আর চাকরি করা হবে না। বেলাকোবার চাকরির মেয়াদ ফুরালে আমি কালিয়াগঞ্জে আবার একটা স্কুলে চাকরি পাই। সাইকেল চালিয়ে ছ'কিলোমিটার দূরের স্কুলে যেতাম। মাইনে পেতাম 'কালেকশন' অনুযায়ী কখনও আটান্ন, কখনও পঁয়ষট্টি, আবার কখনও চুরাশি টাকা। কিন্তু ঘটনার ঘনঘটায় কালিয়াগঞ্জের মেয়াদ ফুরানোর আগেই আমাকে সেদিকে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল অবশ্য অন্য একটা কারণে। একদিন আমার বাড়ির সামনে একটা পোস্টার লাগানো হয়েছে দেখেছিলাম— যাতে লেখা ছিল 'শ্রেণিশত্রুদের খতম করো'। ভাষাটা নতুন নয়, নতুন ছিল সঙ্গে লেখা শ্রেণিশত্রুদের নামের তালিকাটা। সে তালিকায় দেখলাম নিজের নামটাও স্থান পেয়েছে। যে রাস্তা দিয়ে কালিয়াগঞ্জে চাকরি করতে যেতাম, পুলিশ সে রাস্তা দিয়ে আমাকে একা যাতায়াত করতে নিষেধ করল। সে রাস্তায় এর মধ্যেই তিনটে মার্ডার হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটাও খুব কাছে। শেষ যে ব্যক্তি খুন হয়েছিলেন, তিনি কংগ্রেসের মুকুল মজুমদার। তাই পুলিশের পরামর্শ উপেক্ষা করিনি। কিন্তু এর পরে রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুব দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।

'৭১-এর কলকাতা, তারুণ্যের আহ্বান তপেশ— এই টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়েই আমরা এসে পড়লাম ১৯৭২-এ। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপর সময়টা। এই পটভূমিতে চলে এল '৭২-এর নির্বাচন। এর আগেই দিনগুলি যথেষ্ট ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে কাটালেও ইন্দিরাজি যে প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলি সে সময় নিচ্ছিলেন, এবার তার ফল পাওয়া গেল। যদিও মুক্তিযুদ্ধের কয়েক মাস আগেই তিনি সরকার ভেঙে দিয়ে লোকসভা নির্বাচন এক বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, এবং ৩৫৪টি আসনে জিতে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক ও কয়লাখনির জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপ, গরিবি হঠাও স্লোগান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে দেশের মানুষ আস্থা রেখেছিলেন। '৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে সে আস্থা পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচকরা দেখালেন। তদুপরি আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে সাফল্যলাভের কারণটাও প্রভাব ফেলেছিল সাংঘাতিক। সাংসদ সিদ্ধার্থশংকর রায় '৭২-এর নির্বাচনে বিধায়কের পদেও দাঁড়ালেন এবং জিতলেন। জলপাইগুড়ি থেকে অনুপমদা জিতলেন বাইশ হাজার ভোটে। রাজ্য কংগ্রেস এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। সাংসদের পদ ত্যাগ করে সিদ্ধার্থশংকর রায় শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। সিদ্ধার্থবাবু সাংসদের পদ ছেড়ে দেওয়ায়

জলপাইগুড়ি লোকসভার আসনটিতে উপনির্বাচন হল। সেখানে তাঁর স্ত্রী মায়া রায় দাঁড়িয়ে প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতলেন। মন্ত্রিসভায় অনুপমদাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়, কিন্তু স্থানীয় রোগীরা বিপদে পড়বে জেনে অনুপমদা মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ যুগে এসব ভাবাটাও কষ্টকর, কিন্তু এ আমরা ঘটতে দেখেছি। এ নিয়ে আমি কয়েক মাস আগে একটি লেখা লিখেছিলাম অনুপমদাকে স্মরণ করতে গিয়ে।

১৯৭১-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রিয়দা সাংসদ হয়েছিলেন। সুব্রতদা (মুখোপাধ্যায়)-ও '৭১-এ বালিগঞ্জ থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন এবং '৭২-এ আবার জেতেন। ইন্দোর সম্মেলনের কালে প্রিয়দা যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি। প্রিয়দা '৭২-এ সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে যাওয়ার কারণে রাজ্য যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব পায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিদ্ধার্থদা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কারণে আমরা জলপাইগুড়িতে ভালমতো বিজয় উৎসব করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। তখন আমি, রাতুলদা, অনুপমদা সিদ্ধার্থদার কাছের লোক বলেই পরিচিত ছিলাম। শেখরকেও খানিকটা 'কাছের লোক' হিসেবে ধরা হত। ফণীন্দ্র দেব স্কুলের মাঠে বিজয় উৎসবের শুরুতেই সবাই সিদ্ধার্থদাকে চেপে ধরল এই মর্মে যে, মিঠুকে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে আনা হোক। তিনি যদি প্রিয়দাকে বলে দেন, তাহলেই ব্যাপারটা ঘটে যাবে। প্রিয়দা মঞ্চেই ছিলেন। সিদ্ধার্থদা ওঁকে বললেন, 'দেবপ্রসাদকে যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি করে দাও।' কিছুক্ষণ পর বক্তৃতা দিতে উঠে প্রিয়দা মঞ্চ থেকেই জানিয়ে দিলেন যে, আমাকে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করা হল।

সে সময়ে আমি জলপাইগুড়িতে ভালই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি। কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনও দিনও উঠে যাওয়ার জিনিস নয়। তখনও জলপাইগুড়িতে একদিকে অনুপমদা-সহ ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জের বিধায়করা, অন্য দিকে জগদানন্দ রায়, শ্রীরাম সিং প্রমুখ। প্রথম দলটি 'প্রো সিদ্ধার্থ' গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ছিলেন স্নেহশীল। ফলে প্রিয়দা আমার নাম প্রস্তাব করলেও তা নিয়ে কোনও দ্বিমত দেখা যায়নি। এখানে বলে রাখি যে, ওই '৭২ সালেই আমি আর শেখর বসেছিলাম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চাকরির পরীক্ষায় এবং দু'জনেই পাশ করি। শেখর বাড়ির চাপ সামলাতে চাকরি নিতে বাধ্য হল। আমিও ভাবছিলাম ব্যাঙ্কেই ঢুকে যাব, কিন্তু শ্রীরামদা বললেন, 'তুই চাকরি করলে কংগ্রেসটা কে করবে?' এই জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে আমি ঠিক করলাম কংগ্রেসই করব। যা-ই হোক, আমি রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছি জেনে আমার সহকর্মী ও বন্ধুরা বেজায় উল্লসিত। আমি কলকাতায় গেলাম নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা সেরে ফেলার জন্য। কিন্তু আমাকে দেওয়া হল সম্পাদকের নিয়োগপত্র! তবে যে প্রিয়দা বলেছিলেন 'সাধারণ সম্পাদক'-এর কথা?

অচিরেই জানলাম যে, কলকাতায় বিশ্বরঞ্জন-শোভনদেবদের লবি চাইছে না যে, আরও একটা সাধারণ সম্পাদক রাজ্য যুব কংগ্রেসে নেওয়া হোক। কিন্তু জলপাইগুড়ি লবি তা মানবে কেন? তারা মানুদা-(সিদ্ধার্থশংকর রায়)-কে চাপ দিতে লাগল। শেষে সভাপতি সুদীপ নিমরাজি হয়ে জানাল যে, প্রিয়দা যখন বলেছে, তখন আমাকে সাধারণ সম্পাদকের পদই দেওয়া হবে। সেটাই হল। এই পদ পাওয়াটা আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম উত্তরণ। কিন্তু সে উত্তরণ মোটেই সুখের হয়নি। প্রচণ্ড বিরোধিতা অতিক্রম করে ফল লাভ করতে হয়েছিল আমায়।

কলকাতায় আমি আর মন্ত্রী অরুণ মিত্রর পিএ রবীন পাইন— এই দু'জন মিলে এমএলএ হস্টেলের একটা ঘর দখল করলাম। সে ঘরটাই হয়ে উঠল কলকাতায় জলপাইগুড়ির ক্যাম্প। রাজনীতির কাজে যে-ই আসত জলপাইগুড়ি থেকে, সে-ই উঠত ওই ঘরে। কে জানি নাম দিয়েছিল 'সিআরপি ক্যাম্প'। কোনও কোনও দিন সে ঘরে দশ-বারো, এমনকি আঠারোজনও থেকেছে। তা, এই ক্যাম্প-জীবনে আমিও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ধীরে ধীরে। মনের মধ্যে একটু গর্বও ছিল এই ভেবে যে, মানুদা আর মায়া বউদি আমাকে বেশ পছন্দ করেন।

সাকুল্যে তিন বছর ছিলাম এই ২/১১-এর ঘরটায়। বড় বর্ণময় সে অভিজ্ঞতা। রবীনের টানে পাহাড়ের কর্মী থেকে আমার টানে চা-বাগানের কর্মী— কে না এসে থেকেছে! সঙ্গে ছিল 'কর্মপ্রত্যাশী'দের আস্তানা গেড়ে থাকা। এমন দু'জন ছিল জলপাইগুড়ির। একজন টুবলি, আর অপরজন পলান সরকারের ছেলে প্রদীপ সরকার। টুবলিকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রিসেপশনে চাকরি করে দিয়েছিলাম, আর প্রদীপের জন্য করেছিলাম কলকাতার ৩সি রুট সমেত বাসের ব্যবস্থা। আমি নিজে অবশ্য প্রিয়দার ব্যবস্থা করে দেওয়া রাজ্য যুব কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ। প্রভাস শ্যামের কাছ থেকে মাস গেলে ৩০০ টাকা আনতে যেতাম। তার মধ্যে সে যতক্ষণ খালি গায়ে জাঙিয়া পরে বসে তেল মাখত, ততক্ষণ বসে তাকে 'গ্যাস' দিতে হত। তার চেহারা, তার বক্তৃতা, তার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা— ইত্যাকার স্তুতির পর তিনি যে টাকাটা দিতেন, সেটাই পুরো মাসের ব্যবস্থা।

'৭০-'৮০-র দশক হলেও ৩০০ টাকা যথেষ্ট ছিল না তখন। উপরন্তু ক্যান্টিনের মালিক পার্শ্ব ঘোষের ম্যানেজার যখনই হিসেব মেলাতে পারত না, আমার নামে বাকি লিখে রাখত। বিন্দুতেই সিন্ধু। ক্যান্টিনে বাকির পাহাড় জমে ১,৮০০ টাকা স্পর্শ করল। ফলে ঘোষবাবুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না আমার। সেটাই চলছিল। উনি আছেন, আমি নেই। আমি আছি, উনি নেই— এমন করে কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর একদিন দুপুরবেলায় উনি ওঁত পেতে ছিলেন আমি কখন ঢুকি তা দেখার জন্য। আমিও শেষ মুহূর্তে দেখে ফেলেছিলাম যে, উনি আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখছেন। সেটা ছিল গরমের দুপুর। প্রদীপ ঘরে ছিল। আমি ঢোকার পাঁচ মিনিটের মাথায় দরজায় বেল। বুঝলাম যে পার্শ্ব ঘোষ। উপায় না দেখে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রদীপকে দরজা খুলতেই হল অগত্যা।

'মিঠু এল মনে হল?'

'না না। দাদা তো আসেইনি।' পার্শ্ব ঘোষের প্রশ্নের জবাবে বলল প্রদীপ।

'তাহলে এখানে কে শুয়ে?'

'মেসোমশাই (আমার বাবা), ওঁর অসুখ। ডাক্তার দেখাতে এসেছেন।'

'তা-ই? তাহলে তো আমাকে একবার ওঁকে দেখতে হয়।'

বলেই উনি আমার মুখ থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিলেন। এর পর 'হে হে' করা ছাড়া আমার আর কী উপায়!

'আর কত ঘোরাবে মিঠু?' উনি বললেন, 'এবার টাকাটা দাও।'

আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে, '১,৮০০ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কীভাবে কমপেনসেট করতে পারি, বলুন।'

'আমার ভাগনে ভানুটার একটা চাকরি করে দাও। আমি আর টাকা চাইব না।'

'ঠিক আছে। কিছু সময় দিন। দেখছি।' বললাম আমি।

এরই মধ্যে সুব্রতদার নির্দেশে বীরেনদা (বীরেন মোহান্তি) আমাকে সিআইটি ফ্ল্যাটটা জোগাড় করে দিয়েছেন। এক কামরার ফ্ল্যাট। আমিও যাব যাব করছিলাম। কারণ, বিধানসভার স্পিকার বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছেন যে, নন-এমএলএ-রা ঘর দখল করে কী করে আছে?

রামকৃষ্ণ সারোগি (রাষ্ট্রমন্ত্রী, পূর্ত) মহাশয়কে ধরে ভানুর জন্য একটা নিয়োগপত্র আনা হল। পার্শ্ববাবু বাকিটা ছেড়ে দিলেন। আমিও হস্টেল ছেড়ে দিলাম। আর পূর্ত দপ্তরও ভানুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিল। কারণ ওটা ছিল এক মাসের 'লিভ ভ্যাকান্সি'।

(ক্রমশ)

অরণ্য মিত্র

লাল চন্দন বোঝাই গাড়িগুলি প্রায়শই তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে যায়। মাল ঠিক ঠিক জায়গায় খালাসও হয়ে যায়। মিডিয়াতে আজকাল প্রায় দিনই চন্দন ধরা পড়ার খবর বার হচ্ছে। কিন্তু ডুয়ার্সের অন্ধকার হঠাৎ তো কেবলমাত্র লাল চন্দন নিয়ে নয়, আরও বহু কিছু ঘটনা প্রতিদিন-প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে ডুয়ার্সের ছায়াচ্ছন্ন ভূখণ্ডে। সেইসব খবর যে অজানা, একেবারেই তা নয়। ডুয়ার্সে নারী ও তার শরীর নিয়ে যে লাস্যময় ভুবন, তাও অবাক-করা। সেসব এখন মিডিয়ার দৌলতে আলোকময় হয়ে ওঠেনি ঠিকই, তবে পর্ন দুনিয়ার প্রায় সমস্ত উপকরণ সুলভে মিলছে নদী-পাহাড়-জঙ্গলাবৃত ডুয়ার্সে। বলা যায়, ডুয়ার্স এখন অপরাধজগতের স্বর্গ।

৩৭

সোনারপুরের খানিক আগে একটা গাছতলায় বাঁশের বেঞ্চিতে বসে কনক দত্ত চা খাচ্ছিলেন। পরি ঘোষালের ছবি তোলার অভ্যেস আছে এবং কাজটি তিনি মোবাইল ক্যামেরাতেই করে থাকেন। অদূরে কনক দত্তর গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। পরি ঘোষাল তাঁর বনেটে কোমর ঠেকিয়ে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুটো কুকুর ছানার ভাবভঙ্গি ডিজিটাইজ করছিলেন মন দিয়ে। চায়ের দোকান থেকে অনতিদূরে একটা রাস্তা মূল সড়ক থেকে ডান দিকে চলে গিয়েছে। সেটাই হুড়াতলি গ্রামের যাওয়ার রাস্তা। সাইনবোর্ডে লেখা আছে, হুড়াতলি পর্যন্ত রাস্তা ৪.২ কিলোমিটার এবং তার নির্মাণ ব্যয়ের পরিমাণ। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে। চা-ওয়ালা নিতাই পালের নাম শুনে একবারেই শনাক্ত করতে পেরেছে। সে নাকি এদিককার অন্যতম প্রতিমা নির্মাতা। দেবদেবীদের মুখের ছাঁচ নিজে বানাতে পারে, এবং মুখের ছিরিও নাকি দেখার মতো। এক কথায়, নিতাই পাল এলাকার জনপ্রিয় ব্যক্তি।

'ফোন নাম্বার জানেন?'

কনক দত্তর কথায় চা-ওয়ালা হেসে বলেছিল, 'কাত্তিকদা তো মোবাইল চালাতেই পারেন না। তবে কারখানাতেই থাকেন। লোক গিয়ে কথা বলে। বাড়ি আর কারখানা একই উঠোনে। আপনি কি প্রতিমার অর্ডার দেবেন?'

কনক দত্ত আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। কেবল বলেছিলেন, 'ডুয়ার্সের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে একটা সমীক্ষা করব বলে যাচ্ছি।'

কার্তিক পালের মতো মোবাইল চালাতে না-জানা মানুষ এখনও দেশে অনেক। এদের মতো লোকদের ভোটার কার্ড আর ফোটো জোগাড় করে অপরাধীরা কিছু সিম কার্ড বানিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। ইদানীং ফোনের সংযোগ নেওয়ার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আসায় ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মোবাইল ফোন চালু হওয়ার পর কার্তিক পালদের মতো লোকের নামে তৈরি করে রাখা সিম কার্ডেরও অভাব নেই। সেসব নিয়ম করে রিচার্জ করা হয়। অপরাধচক্রের কর্তাব্যক্তিরা যখন এলাকায় নজরদারি করতে বার হয়, তখন কয়েক ঘণ্টা পরপর সিম বদলাতে থাকে। দেশের নিজস্ব জিপিএস স্যাটেলাইট না থাকায় এদের ট্র্যাক করতে সমস্যাও ছিল অনেক। অবশ্য কিছুদিন আগে ভারতের প্রথম জিপিএস স্যাটেলাইট কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করেছে। এতে অনেক সুবিধা হবে নিশ্চয়ই।

'চলুন তবে, এগই।' পরি ঘোষালের উদ্দেশে কথাটা বলে কনক দত্ত চায়ের দাম মিটিয়ে গাড়ির দিকে এগলেন। গাড়ি তিনিই চালাচ্ছেন। গতকাল বিকেলে পরি ঘোষাল জলপাইগুড়ি থেকে ধূপগুড়িতে কনক দত্তর বাড়ির অতিথি হয়ে এসেছেন কার্তিক পালের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনায়। কনক দত্তর কথায় তিনি মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, 'ফিউচারে দেখবেন প্রতিমা বানাবার লোকই পাওয়া যাবে না। মৃৎশিল্পীদের

নেক্সট জেনারেশন কেউ আসছেন না।'

'কার্তিকদার তো ছেলেপুলেই নেই! বউও মরে গিয়েছে। ভাইয়ের কাছে থাকেন। সে মরলে এদিকে ঠাকুর পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে।'

'জগন্নাথ। উলটো দিকের বাড়িতেই থাকে। সে তো কাত্তিকদার ধম্মছেলে। গেলবারের পুজোর আগে চার হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল কিনে দিয়েছে জগনকে। ছেলেটা অবশ্য খড় দিয়ে প্রতিমার কাঠামোটা বানাতে শিখেছে। কাত্তিকদাকে হেল্প করে চাপ পড়লে।'

টিলের কার্যকারিতায় কনক দত্ত মনে মনে বেশ খুশি হলেন। এবার মিলতে শুরু করছে। কার্তিক পালের নামে জগন্নাথ সিম কার্ড বানিয়ে ফোন করেছিল। যে নাম্বারে ফোন করেছিল, সেটাও আইডেন্টিফাই করা গিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তথ্য এখনও কনক দত্তর হাতে আসেনি। জগন ওরফে জগন্নাথকে এবার প্যাঁচে ফেললেই মনে হচ্ছে একটা বড়সড় দরজা খুলে যাবে চোখের সামনে।

আসলে শ্যামলকে খুন করার কারণ নিয়ে কনক দত্ত এখনও অন্ধকারেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। একটি ছেলেকে বাড়ি থেকে প্ল্যান করে তুলে নিয়ে যাওয়ার পিছনে সম্ভাব্য প্রথম কারণ হল প্রেমঘটিত ব্যাপার। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অপরাধী হত নবিশ এবং এতদিনে ধরা পড়ে যেত। পুলিশের তরফ থেকেও কেসটা চেপে দেওয়ার কোনও কারণ থাকত না। শ্যামল অন্তর্ধান রহস্যের পিছনে কোনও একটা জটিল আর গম্ভীর ষড়যন্ত্রের আভাস কনক দত্ত অনুমান করতে পারছেন। কিন্তু কী সেই ষড়যন্ত্র?

কনক দত্ত একটু উত্তেজনা অনুভব করলেন। দুপুর সাড়ে বারোটায় মোটা জ্যাকেট পরে তাঁর একটু গরম লাগছিল। তিনি সেটা খুলে ফেলে স্টিয়ারিং-এ বসলেন। পরি ঘোষাল পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি ঠান্ডা কম লাগছে?'

'জগন্নাথের কথায় আপনারও তো তা-ই লাগা উচিত ছিল।'

'আমার তো মনে হল শ্যামলের কেস এবার এন্ড হবে। তাই নো এক্সাইটমেন্ট। আপনি হয়ত ব্যাপারটা জানবেন। কিন্তু শাস্তি দিতে পারবেন না।'

'জগন্নাথকে দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে। সে কদ্দূর জানে, সেটাও একটা প্রশ্ন।' একটা ছাগল ছানাকে রাস্তা পার হতে দিয়ে কনক দত্ত গাড়ির গিয়ার বদলালেন। 'ভিতর ভিতর একটা কমপ্লিকেটেড থিয়োরি কাজ করছে। শ্যামল মাস্ট নিউ সামথিং।'

'কী এমন জানতে পারে সে ছেলে?' পরি ঘোষাল যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন প্রশ্নটা। 'অবশ্য ডুয়ার্সে তো জানতে পারার মতো ঘটনার অভাব নেই। বাই অ্যাক্সিডেন্ট, যদি কিছু জেনে ফেলে।'

এর পর খেত, বাঁশবন, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দার্শনিকের মতো বললেন, 'ডুয়ার্স গেটিং ডেঞ্জারাস! লাইন বিটউইন রিভারস অ্যান্ড মাউন্টেইন নট অ্যাট অল গ্রিন। দেয়ার আর ডিফারেন্ট শেডস অব গ্রে।'

৩৮

কাশিয়াগুড়িতে এসে রুপালি জানাল যে, আজ ট্রেনিং হবে না। কী একটা কাজে সেন্টারের সবাই বাইরে গিয়েছে। শুক্লাদি কেবল বাইরে একটা ছোট টুলে বসে রোদ্দুর মাখছিল। রুপালি এটা ভাবেনি। ইচ্ছে করলে এখনই ধূপগুড়িতে ফিরে গিয়ে আলিপুরদুয়ারের বাস ধরতে পারে। কিন্তু এখনই সেখানে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না তার। ট্রেনিং না হওয়ার কারণে কয়েকটা ঘণ্টা সে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারে এদিক-ওদিক। কিন্তু কোথায় যাবে? রুপালি এই অবস্থায় যা করা স্বাভাবিক, সেটাই করল। সুরজকে ফোন করল সে। সুরজ বলল, 'হ্যালো।'

'আমাদের আজ ট্রেনিং বন্ধ।'

'তুমি কোথায় রুপালি?' সুরজের গলা ব্যগ্র শোনাল, 'সেন্টারে?'

'হুঁ।'

'থাকো। আসছি এখুনি।'

মোবাইল ব্যাগে ঢুকিয়ে রুপালি এল শুক্লাদির কাছে। শুক্লাদি এতক্ষণ তাকে লক্ষ করছিল। রুপালি কাছে আসতেই বলল, 'সুরজকে ফোন করলি, তা-ই তো?'

রুপালি একটু লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। শুক্লাদিও হাসল সেই হাসির সঙ্গে। তারপর বলল, 'আজকে তো ছুটি। সুরজের বাইকে চেপে ঘুরে বেড়াবি, তা-ই তো?'

রুপালি হাসি মুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। শুক্লাদি এবার বলল, 'এখানেই তো গল্প করতে পারিস। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি দরকার কী?' তারপর রুপালির শরীরটা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর চলছে তোদের? বুকে দিসে?'

রুপালি এবার বেগুনি হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ!'

'ন্যাকামো করিস না তো! সুরজ সেলেটা খারাপ না। আর সেলেরা একটু খাই খাই করবে। আমাকে লজ্জা করে লাভ নাই বুজলি?'

রুপালি বেগুনি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। শুক্লাদি মিথ্যে কিছু বলছে না। ছেলেদের সে খানিকটা জানে। কিন্তু সুরজকে 'ছেলে'দের মধ্যে এই মুহূর্তে ফেলতে পারছিল না রুপালি। সে কয়েক সেকেন্ড লজ্জা লজ্জা মুখে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিস্তার পাওয়ার জন্য 'ওখানে গিয়ে বসি' বলে শুক্লাদির কাছ থেকে দৌড়ে চলে গেল সেন্টারের বারান্দায়। তারপর বুঝতে পারল, কান দিয়ে আগুন বার হচ্ছে।

সুরজ এল মিনিট কুড়ি পরে। রুপালি বারান্দা থেকে নামতে গিয়েও থমকে গেল। শুক্লাদি আগের জায়গাতেই অলসভাবে বসে আছে। সুরজ বাইক রেখে শুক্লাদির পাশ দিয়েই হেঁটে এল তাঁর দিকে। রুপালি ভাবছিল, এবার শুক্লাদি ঘুরে তাকাবে। কিন্তু সেটা ঘটল না। সুরজ বারান্দায় উঠে বলল, 'চলো তবে ঘুরে আসি।'

রুপালি কিছু না বলে সুরজের মুখের দিকে তাকাল। কালো প্যান্ট আর সবুজ রঙের জ্যাকেট পরেছে সুরজ। চুলে ধুলো লেগে আছে। মুখ-চোখে একটা খুশির ভাব। রুপালি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু সুরজ বোধহয় সে মুগ্ধতা বুঝতে পারল না। রুপালি একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। সে রুপালির পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

রুপালি কিছু না বলে সুরজের মুখের দিকে তাকাল। কালো প্যান্ট আর সবুজ রঙের জ্যাকেট পরেছে সুরজ। চুলে ধুলো লেগে আছে। মুখ-চোখে একটা খুশির ভাব। রুপালি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু সুরজ বোধহয় সে মুগ্ধতা বুঝতে পারল না। রুপালি একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। সে রুপালির পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

মুগ্ধতা থেকে ফিরে এসে রুপালি বলল, 'এখানে থাকলে হয় না?'

সুরজ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন শুক্লাদিকে দেখা গেল বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে। তার আচরণে একটু ব্যস্ত ভাব। রুপালিকে পাত্তা না দিয়ে সুরজের দিকে তাকিয়ে শুক্লাদি বলল যে, সে এখনই ধূপগুড়িতে যাচ্ছে। জরুরি একটা প্যাকেট এসেছে। সেন্টারের লোক ছাড়া দেবে না। সেন্টার খোলাই থাকল। সুরজ যেন না ফিরে আসা পর্যন্ত থাকে। কথাগুলো বলেই শুক্লাদি সেন্টারের ভিতরে ঢুকে একটা ব্যাগ নিয়ে

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। সুরজের যে কিছু বলার থাকতে পারে, সেটা ভাবলও না।

সুরজ অবশ্য কিছু বলল না। শুক্লাদির চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রুপালির দিকে ফিরে বলল, 'চলো, ভিতরে গিয়ে বসি।'

রুপালি বিনা বাক্যে অফিস ঘরে ঢুকল। সুরজ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রুপালির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কিন্তু রুপালির অস্বস্তি হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি কেউ দরজায় টোকা দেবে কিংবা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়বে। সুরজ সেটা আন্দাজ করে বলল, 'শুক্লাদি ঘণ্টা দুয়েকের আগে ফিরবে না।' ততক্ষণে সে রুপালির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছে। রুপালি হাতটা ছাড়াল না।

'আই লাভ ইউ রুপালি!' আরেকটা হাত রুপালির কাঁধে রেখে বলল সুরজ। রুপালি একটু কেঁপে উঠল সেই কথার প্রতিঘাতে। তারপর সুরজকে দু'হাতে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। তখন সুরজকে দেখাচ্ছিল অভিজ্ঞ প্রেমিকের মতো। কিছুক্ষণ সুরজের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদার পর রুপালি মাথা তুলল। চোখের কাজল লেপটে গিয়েছে তার। সুরজ পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো ভাল করে মুছে দিয়ে বলল, 'এবার তোমাকে একটু আদর করব।' কথাটার অর্থ বুঝতে দু'সেকেন্ড সময় লেগেছিল রুপালির। কিন্তু সুরজ ততক্ষণে মুখে, গালে, কপালে চুমু খেতে শুরু করে দিয়েছে। দুটো হাতের একটা তার শরীরটা জড়িয়ে ধরেছিল, আর দ্বিতীয়টা ঘুরছিল তার পিঠ থেকে নিতম্বে। তারপর একটা থাবায় পরিণত হয়ে বুকের ওপর আছড়ে পড়তেই রুপালি হাতটা চেপে ধরে বলল, 'বেশি না। প্লিজ। অল্প।'

রুপালির আর্তিতে কান না দিলেও সুরজ কিন্তু সত্যিই তার জামাকাপড় খোলার দিকে গেল না। ঠেলে নিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে উন্মত্তের মতো চটকাল আর চুমু খেল কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত হয়ে রুপালির এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুল সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ভয় নেই। এর চাইতে বেশি কিছু করব না।'

বলেই আবার ঠেসে ধরল রুপালিকে। কিন্তু কথা রাখল।

৩৯

লাল চন্দন বোঝাই চারটে গাড়ি তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে গিয়েছে জেনে ব্রজগোপাল হনুমানদাস নিশ্চিন্ত হয়ে টিভিতে হিন্দি সিনেমার নাচ দেখছিলেন। কাঠ নিয়ে এখন টেনশনের কিছু নেই। মাল খালাস হয়ে জায়গামতো চলে যাবে। লাল চন্দনের চোরা বিজনেস ব্রজগোপালের ঠাকুরদা শুরু করেছিলেন। তখন অবশ্য এই ব্যবসাটা চোরা ছিল না। বাপের আমলেও হুজ্জোতি ছিল না তেমন। কিন্তু ইদানীং চাপ খুব বেড়ে গিয়েছে। মিডিয়াতে প্রায় দিনই চন্দন ধরা পড়ার খবর বার হচ্ছে। ডুয়ার্সে চন্দন পাচার ছাড়া আরও অনেক কিছু হয়, কিন্তু খচ্চর মিডিয়াগুলো লাল চন্দন নিয়েই ব্যস্ত।

টিভিতে ফুল্লরা অরোরা বলে এক নতুন নায়িকা ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হিপ নাচাচ্ছে। সাংঘাতিক ফিগার! হিপটা তো বোমার মতো। এইরকম পিছন দেখালে ব্রজগোপালের পঞ্চাশ বছরের পুরনো লিঙ্গ তাজা হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন হল তিনি উপোস করে আছেন। সুরেন বলে একটা গোর্খা ছেলে তাঁকে মেয়েদের খোঁজ এনে দেয়। উপোস থাকা সত্ত্বেও সুরেনদের খবর দেননি ব্রজগোপাল। কানাঘুষোয় শুনেছিলেন যে, শিলিগুড়ির কোনও এক ব্যবসায়ীকে নাকি মেয়েদের টোপ দিয়ে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করে বাড়িতে ফিরতে পেরেছে সে ব্যবসায়ী। খবরটা সত্যি কি মিথ্যে তা অবশ্য তিনি যাচাই করেননি। কিন্তু খবরটা কানে আসার পর থেকে ব্রজগোপাল উপোস করতে শুরু করেছিলেন। মেয়ে নিয়ে তিনিও বাইরে যান। কিডন্যাপ হওয়ার সম্ভাবনাটা তিনি বিচার করেননি কখনও। তাই ব্রজগোপাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এবার থেকে মেয়ে নিয়ে শিলিগুড়ির বাইরে যাবেন না কোথাও। সুরজের বদলে মেয়ের খোঁজ করবেন ইন্টারনেটে।

পঞ্চাশ পেরলেও ব্রজগোপাল বেশ সুপুরুষ। শরীরে চর্বি সামান্য। চুল কমলা রঙে রাঙানো। সুট-বুট পরে বেরুলে তাঁকে এখনও ভালোই দেখায়।

ফুল্লরা অরোরা এবার ক্যামেরার দিকে ঝুঁকে পড়ে শরীর ঝাঁকাচ্ছে। তার বুক দুটো দেখতে দেখতে ব্রজগোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। উপোস ভঙ্গ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। ইন্টারনেটে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে 'ডুয়ার্স ফ্যান্টাসি' বলে একটা গ্রুপ পেয়েছিলেন তিনি। ডুয়ার্সের যে কোনও শহরে বসে মেয়ে পেতে চাইলে সেখানে নাম লেখাতে হয়। নিজের ই-মেল আইডি দিয়ে নামও লিখিয়ে ফেলেছিলেন ব্রজগোপাল। তারপর আর মেল চেক করেননি। ফুল্লরা অরোরার নাচ দেখতে দেখতে তিনি মেল খুললেন। এই আইডিয়া তিনি বানিয়েছেন মেয়ে খোঁজার জন্য। ইনবক্সে 'ডুয়ার্স ফ্যান্টাসি'র উত্তর দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। একটাই মেয়ের প্রোফাইল পাঠিয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়ে। নাম দেওয়া আছে 'দোয়েল'। সঙ্গে অ্যাটাচ করা গোটা চারেক ফোটো।

ফোটো চারটে দেখে ব্রজগোপালের উত্তেজনা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। ফুল্লরা অরোরার কথা ভুলে গিয়ে তিনি মোবাইলের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে থাকলেন হাঁ করে। ফোন নম্বর দেওয়া আছে। দোয়েল নিজেই ধরবে। ব্রজগোপাল তক্ষুনি ফোন করলে সুখী হতেন, কিন্তু শিলিগুড়িতে কোথায় এই মেয়ের সঙ্গে বিছানায় খেলবেন, সেটা নিশ্চিত ছিল না বলেই নিজেকে সামলালেন। হোটেলের অবশ্য অভাব নেই। কিন্তু হোটেলের বদলে খালি কোনও ফ্ল্যাট পেলে ভাল হত।

কথায় বলে, আন্তরিক উদ্যোগে অসাধ্যসাধন হয়। ব্রজগোপাল সফল হলেন। এদিক-ওদিক বিস্তর ফোন করার পর সন্ধে নাগাদ একটা ফ্ল্যাট মাসিক আট হাজার টাকায় ভাড়া করে ফেললেন তিনি। ফ্ল্যাট নিশ্চিত হতেই ফোন করলেন ই-মেলে দেওয়া দোয়েলের নম্বরে। বারকয়েক রিং করলেন ব্রজগোপাল, কিন্তু কেউ ধরল না। হতবুদ্ধি হয়ে ব্রজগোপাল আরও ফোন করবেন কি না তা নিয়ে যখন ভাবছেন, তখন একটা এসএমএস এল দোয়েলের নাম্বার থেকে। তাতে লেখা— 'ডু ইউ নিড দোয়েল?' ব্রজগোপাল সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর পাঠালেন— 'ইয়েস।' মিনিট দুয়েক পর জবাব এল, 'কল ইউ আফটার টু আওয়ারস।'

তারপর থেকে টানা দু'ঘণ্টা কখনও পায়চারি করে কখনও টিভি দেখে কাটিয়েছেন ব্রজগোপাল। আর অন্তত পঞ্চাশবার দেখেছেন ফোটো চারটে। এই কোয়ালিটির মেয়ে শিলিগুড়িতে পাওয়া যাবে, সেটা সুরজের তালিকা দেখে কখনওই মনে হয়নি ব্রজগোপালের। সত্যি! ইন্টারনেটের জুড়ি নেই।

দু'ঘণ্টা কাটতেই সত্যি সত্যি ফোন বেজে উঠল ব্রজগোপালের। দোয়েলের নাম্বার। ব্রজগোপাল ধপাস করে সোফায় বসে ফোনটা ধরে ব্যগ্র স্বরে বললেন, 'হ্যালো।'

'দোয়েল স্পিকিং।' ওপাশ থেকে নরম একটা স্বর ভেসে এল। 'আপনার নাম-ঠিকানা জানতে পারি?'

'হোয়াই নট?' ব্রজগোপাল জানালেন। তিনি বাংলা বলেন বাঙালির মতোই। দোয়েল মেয়েটা যে বাঙালি হবে, সেটা তিনি অনুমান করেছিলেন। সেটা মিলে যাওয়ায় আহ্লাদিত বোধ করলেন ব্রজগোপাল। নিজের নাম আর সদ্য ভাড়া করা ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা বলতেই ওপাশ থেকে শোনা গেল দোয়েলের নরম, মার্জিত কণ্ঠ।

'থ্যাঙ্কিউ। আমি সবরকম সার্ভিস দিই মিস্টার হনুমানদাস। যা বলবেন।'

উপোস ভঙ্গের স্বর্গীয় সম্ভাবনায় আনন্দে লাফাতে লাগলেন ব্রজগোপাল হনুমানদাস।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

২৮

বিয়ে নিয়ে অমিয়র মাথাব্যথা নেই। বউ একটা আসবে ঠিকই, তবে সে এখন অমিয়র সঙ্গে থাকবে না। বিয়ের পর চলে যাবে বাপের বাড়িতে। অমিয় ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতায় পড়তে যাবে— এটা নিশ্চিত। তখনও বউ থাকবে বাপের কাছে। বিলেত যাওয়ার সময় এলেই তাকে পাবে অমিয়। সে হানিমুন করবে লন্ডনে। এই অবস্থায় বিয়ে নিয়ে অমিয় বেশ নিস্পৃহ। তার যাবতীয় উৎসাহের কেন্দ্রে এখন নিত্যদা। পাবনার ছেলে নিত্যদা থার্ড ক্লাসে পড়াকালীন কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে চলে যান কলকাতায়। ছাত্র হিসেবে নিত্যদা চৌকশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি পাশ দিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছেন পিডব্লিউডি-তে চাকরি নিয়ে। বাবুপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। পরিবার অবশ্য কলকাতায় আছে।

কিন্তু অমিয়র কাছে নিত্যদার গুরুত্ব ভিন্ন কারণে। নিত্যদা কবিতা লেখেন। তাঁর দুটো বই আছে কবিতার। নাম 'একাকিনী মুকুর' আর 'অগ্নিশলাকা'। কলকাতার পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপাও হয়েছে। 'সাহিত্য বলাকা' নামের একটা কাগজে নিত্যদার কবিতার প্রশংসা করে সাত লাইন লেখাও বেরিয়েছে। সেই কাগজ নাকি রবি ঠাকুরও পড়েন। যদিও নিত্যদা কিছুদিন হল অমিয়কে অঙ্ক শেখাতে আসছেন। ফার্স্ট ক্লাসের অঙ্ক আগাম প্র্যাকটিস করলে সুবিধে হবে ভেবে নিত্যদাকে টিউটর হিসেবে বাবা নিয়োগ করেছেন। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধেবেলায় আসার কথা ছিল নিত্যদার। কিন্তু ছাত্রের মধ্যে কবিতাপ্রীতি এবং সেহেতু নিত্যদাপ্রীতির পরিচয় পেয়ে তিনি আসছেন ঘন ঘন। অঙ্ক তো হচ্ছেই, তার চাইতে বেশি চলছে কবিতা নিয়ে আলোচনা। অমিয় সেই আলোচনায় মুগ্ধ। তার শয়নে-স্বপ্নে এখন নিত্যদা আর কবিতা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। বাবার কানে অবশ্য এসব যায়নি।

গান্ধিজির লবণ আইন ভঙ্গ অভিযানের সূত্র ধরে শহরে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছে, সে বিষয়ে অমিয়র খুব একটা ধারণা নেই। কিন্তু কংগ্রেস নিয়ে কবিতা সে অনেক লিখেছে। গোপাল ঘোষের উৎসাহ পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই আটাত্তরটা কংগ্রেসি কবিতা লিখে ফেলেছিল। কিন্তু নিত্যদা সেসব কবিতা একবাক্যে খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, 'ছন্দ আর মিল মোটামুটি হলেও এক্সপ্রেশন খুব দুর্বল। এসব বিষয় নিয়ে আগুন ধরানো কবিতা লিখতে হবে।'

এই বলে নিত্যদা কাজি নজরুল ইসলামের নাম বলেছিলেন অমিয়কে। এই নামের কোনও কবির কথা তার জানা ছিল না। তাঁর একটা কাব্যগ্রন্থের নাম যে 'অগ্নিবীণা' এবং সেই বইতে যে গনগনে আগুনের মতো কবিতা আছে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর নিত্যদা বলেছিলেন, 'সে বইটা পড়ার পর আমি 'অগ্নিশলাকা' লিখেছিলাম। তার একটা কবিতা শোনাই।'

টেবিলে খোলা অঙ্ক বইটার ওপর ঘুসি মেরে তাল রাখতে রাখতে অতঃপর নিত্যদা শুনিয়েছিলেন নিজের 'অগ্নিশলাকা' বইয়ের কবিতা। শুনে তাক লেগে গিয়েছিল অমিয়র। নিত্যদা প্রচণ্ড উত্তেজনায়, গলার শিরা ফুলিয়ে বলেছিলেন,

পরমাণু আমি, মহাপরিবাহী বিপুল
বিশাল চুম্বক।
রক্ত আনন হেরি গর্জাই, তোরা
যমদূত-বুর্বক।।
আমি সালফার, টেস্ট টিউবের ফুটন্ত
কড়া অম্ল।
আমি হাহাকার, অটল অনড়, তুলাযন্ত্রের
তুল্য।।

প্রায় দশ মিনিট ধরে মুখে-চোখে দারুণ রকমফের ঘটিয়ে কবিতাটা বলেছিলেন নিত্যদা। শেষ করে জামার হাতায় মুখের কোণে জমে ওঠা ফেনা মুছে উজ্জ্বল চোখে জানতে চেয়েছিলেন, 'কেমন লাগল বলো তো?'

'আমার রক্ত গরম হয়ে গেল নিত্যদা!'

'তবেই বোঝো।' জলের গেলাস খালি করে তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিলেন নিত্যদা। 'নজরুলের 'অগ্নিবীণা' পড়লে তো বন্দুক নিয়ে ব্রিটিশদের এগেইনস্টে নেমে পড়তে। তা সে বই আমি তোমায় দেব। কিন্তু স্বদেশি কবিতা লিখতে হলে যেটা শোনালাম, তেমনভাবে লিখতে হবে। এ ছাড়াও আরেকরকম কবিতা আছে। রোমান্টিক পোয়েট্রি। সেসব বিয়ের পরে লিখবে।'

'বিয়ে নিয়ে আমার কোনও ইন্টারেস্টই নেই নিত্যদা।'

'সে সময়মতো হবে।' বলে নিত্যদা মন দিয়েছিলেন জলখাবারে। তিনি খাদ্যরসিক। অমিয়র মা তাই খুশি মনে রকমারি খাবার রান্না করে পাঠিয়ে দেন নিত্যদা এলে। লুচি আর গাজরের হালুয়ায় মন দেওয়ার আগে অবশ্য নিত্যদা হুকুমের সুরে বলেছিলেন, 'আমার খেতে যে সময়টা লাগবে, তার মধ্যে এইরকম একখানা অগ্নিগর্ভ কবিতা লেখার চেষ্টা করো।'

অমিয় অতি উৎসাহ নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছিল লেখার জন্য, কিন্তু দু'লাইনের বেশি এগতে পারেনি। লাইন দুটো ছিল—

হুম হুম হুংকারি গান্ধি যায় ছুটিয়া।
ধুপ ধুপ ইংরাজ ভূমে পরে লুটিয়া।।

নিত্যদা এটা শুনে ফ্যাচফ্যাচ করে হেসে বলেছিলেন, 'এটা শুনলে ইংরেজরা কিছু বলবে না, কিন্তু কংগ্রেসের লোকজন তোমায় জেলে পুরে দেবে। গান্ধিজি আর হুংকার একদম মিলছে না। একে বলে ঔচিত্য দোষ।'

তারপর কৌটো খুলে সিগারেট বার করে আয়েশ করে দুটো টান দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো বিলেত যাবে। তোমার পক্ষে অগ্নিগর্ভ কবিতা না লেখাই ভাল।'

অমিয় এর প্রতিবাদে কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। কারণ বাইরে থেকে বাবার গলা ভেসে আসছিল। তিনি পড়ার ঘরের দিকেই আসছিলেন। নিত্যদা তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দিয়ে একটা খাতা তুলে হাওয়া দিয়ে ধোঁয়া সরাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বাবা দরজার কাছে এসে তা-ই দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে বললেন, 'আরে, অত ব্যস্ত হতে হবে না নিত্য। ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্মোক ফাইন টোব্যাকো? আমার কাছে হাই কোয়ালিটির চুরুট আছে। আমি খাই না অবশ্য। গিফ্ট পেয়েছিলাম। আনতে বলি?'

'না না।' নিত্যদাকে একটু লজ্জিত দেখাল— 'আপনি বসুন।'

'ম্যাথমেটিক্স কেমন চলছে?' অমিয়র ছেড়ে দেওয়া চেয়ারে বসে বাবা জানতে চাইলেন, 'ম্যাট্রিকে ভাল করা চাই।'

'অঙ্কে ওর খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না দাদা।' নিত্যদা জানায়, 'আজকের মতো অঙ্ক হয়ে গিয়েছে। আমরা একটু কারেন্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করছিলাম। টাউনের পলিটিক্স।'

'আর পলিটিক্স!' বাবাকে বেশ আমোদ পেতে দেখল অমিয়— 'টাউনে কংগ্রেসের তো কোমর ভেঙে দিয়েছে। লিডাররা তো সব জেলে নয়, অ্যাবস্কন্ডেড। আরে বাবা, এর নাম ব্রিটিশ! ভবানী চক্কোত্তিকে তো মেরে উকিলপাড়ার মোড়ে ফেলে রেখেছিল। অখিল সান্যালকে লাটাগুড়ির জঙ্গলে ফেলে এসেছে হাত-পা বেঁধে। বাঘে খায়নি ওর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্যি। শুনেছি গয়েরকাটার হাটবাবুর চাকরি গিয়েছে আইন অমান্য করার কারণে। রবি শিকদার, লক্ষ্মণ মৌলিক, বরেন ভৌমিকরাও জেলে। বাকিরা তো আগেই গিয়েছে! আন্দোলন আর বেশি দিন চলবে না।'

রাধাকমলবাবু থামলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, টাউনে আন্দোলন ফুরিয়ে গিয়েছে এবং সেই কারণে তিনি বেশ তৃপ্ত।

'আচ্ছা! টাউনে মুসলিমদের স্ট্যান্ডটা ঠিক কী, সেটা বলুন তো? লিগের তো ভালই প্রভাব আপনাদের টাউনে।'

মুসলিমদের উল্লেখে রাধাকমলবাবুর মুখে একটু তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। শহরে মুসলিমদের ভালই প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। দানধ্যানের পরিমাণও মন্দ নয় তাদের। তা সত্ত্বেও রাধাকমলবাবু মুসলিমদের ঠিক পছন্দ করেন না। তবে মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেসের বৈরিতার বিষয়টি নিয়ে তিনি অবহিত বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলিম প্রসঙ্গ এলে মৌন থাকেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'প্রসন্ন রায়কতের মেয়ের বিয়েতে তো নেমন্তন্ন পাবে। তোমাদের আপিসের সবাইকেই নেমন্তন্ন করা হবে।'

'সে নেমন্তন্ন পেলে যাওয়া যাবে'খন।' নিত্যদা উঠে দাঁড়ালেন— 'কিন্তু আপনি যে ভবানী চক্রবর্তীর কথা বললেন, শুনেছি সে নাকি অমিয়র মতো সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র। অমিয় আবার ওদিকে চলে যাবে না তো?'

'কী যে বলো নিত্য!' রাধাকমলবাবু একটু অসন্তুষ্ট হলেন— 'ইংরেজরা আমাদের শাসন করছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কোয়ালিটিটা দেখো! এই যে টি ইন্ডাস্ট্রি। টাউনের অর্ধেক লোক যার জন্য ফুটানি করে বেড়াচ্ছে, সেটা করল কে? টি-গার্ডেনের লেবারদের মাইনে শুনলে তোমারও হিংসে হবে নিত্য! গার্ডেনবাবুদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তোমার কি মনে হয় ইংরেজরা চলে গেলে এসব থাকবে? ডিসিপ্লিন বলে কিছু আছে আমাদের? আই সাপোর্ট ব্রিটিশ রুল! অমিয় সেটাই শিখেছে, তা-ই না অমিয়?'

রাধাকমলবাবু জিজ্ঞাসু চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। অমিয় একটা ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ বাবা!'

তৃপ্ত পিতার মুখমণ্ডল স্নেহ আর আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এবার সযত্নে নিত্যদাকে বোঝাতে লাগলেন ব্রিটিশদের মাহাত্ম্য। দেশের লোক কি শাসন করার যোগ্য হয়েছে? এই যে টাউনের মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছে যারা, তারা কি নিজেদের মধ্যে গোলমালে জড়িয়ে পড়ছে না? সতীশ গুপ্তর সঙ্গে বিপুল ব্যানার্জির বিরোধের কথা টাউনে কে না জানে! মিউনিসিপ্যাল নিয়েই যদি এত গোলমাল হয়, তবে দেশ চালাবে কী করে? টাউনে বিজলি আসতে চলেছে, ঘরে ঘরে পাইপ দিয়ে পানীয় জলও দেওয়া হবে। ব্রিটিশ ছাড়া এসব হত? গান্ধিজির খেল খতম হল বলে।

রাধাকমলবাবু বক্তব্য রেখে চলেন। বাইরে প্রাক্-শীতের রাত্রি ঝুরঝুর করে হিম ঢালতে থাকে মাটিতে। কেরোসিনের পথবাতির ভুতুড়ে আলোয় কুয়াশার অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে মফস্সল। প্রায় একই পরিবেশে মাথাভাঙায় গগনেন্দ্রর বাড়িতে তখন বেজায় হইচই। রাজীবলোচন ফিরেছেন রাসমেলা থেকে। ঘণ্টাখানেক আগে। *(ক্রমশ)*

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

২

ডুয়ার্সের মানুষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই এনেছি প্রাণীকুলকে। ডুয়ার্সের প্রথম চরিত্র ওরাই। এই প্রসঙ্গে ফের চলে যেতে হচ্ছে বাঘের গল্পে। বাঘ হল বনের সম্পদ। তবু সেই সম্পদকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে বাঘের চামড়া, হাড়, নখ, দাঁত। একজন মানুষ ছিলেন। শিকার ছিল তাঁর নেশা। নানা জায়গায় শিকার করেছেন তিনি। কখনও সুন্দরবনের মানুষখেকোর সঙ্গে, কখনও ওপার বাংলার গন্ডারের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু জীবনে একটা দিন এল। সম্রাট অশোকের যেমন হয়েছিল কলিঙ্গ যুদ্ধের পর। যুদ্ধের তৃষ্ণা মিটে গিয়েছিল তাঁর। সেবার শিকারে গিয়েছেন। রায়ডাক রিজার্ভ ফরেস্টের শালবনে শিকারের মাচান বাঁধা হয়েছিল। একটা বাঘ সে সময় বড় হাঙ্গামা করছিল। গোরু-ছাগল পেরিয়ে যখন মানুষকে আক্রমণ করল, তখন শিকারি ভদ্রলোক এলেন। মাচানের উপর বসে থাকেন রাইফেল নিয়ে। শুকনো পাতার উপর খচমচ শব্দ করে সে এল। বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দেবার আগের মুহূর্তে কপালে বাঁধা টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে শিকারি অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। বাঘের পিছনে দুটো ছোট বাচ্চা নিয়ে বাঘিনি হেলেদুলে হাঁটছে। সেই পারিবারিক ছবি দেখে শিকারি এতটাই আপ্লুত হলেন যে, শিকার করা ছেড়ে দিলেন।

আবার দিব্য সেনের ঘটনা অন্যরকম। শিকারি হিসেবে তাঁর তখন দুর্দান্ত নাম। কিন্তু শিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণটা ভাবতে গিয়ে সেই মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ে যেত তাঁর। সারাদিন কুয়াশায় ভরে আছে। শীত-কুয়াশা উপেক্ষা করে বন্দুকে তেল-টেল দিয়ে তিনি তৈরি। স্টেশনের ওপারের বন থেকে বাঘ নেমে আসছে। লোকালয়ে হানা দিতে শুরু করেছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে সব হাতের বাইরে চলে যাবে। সন্ধে পেরোতেই সঙ্গে টর্চ, রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীত কামড়ে ধরেছে সমস্ত শরীর। হাতে হাত ঘষে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করছেন। ঘুটঘুটে বন শীত জড়িয়ে জবুথবু। এরই মধ্যে নামল বৃষ্টি। ডুয়ার্সের জলবায়ু অন্য ধরনের। বৃষ্টি একবার যদি নামে, শরীর ছেড়ে দিয়ে নামে। ভাসিয়ে দেয় বন-পাহাড়। বরফের ছুরি বিঁধে যাচ্ছিল চোখে-মুখে। ঠিক সেই সময়ে গন্ধটা পেলেন সেনবাবু। শ্বাস টেনে গন্ধটা বুকে নিয়ে বুঝলেন বাঘ আশপাশেই আছে। উত্তর দিক থেকে আসছে ওটা। অন্ধকারে জ্বলছে কয়লার টুকরো। কপালে বাঁধা টর্চ জ্বলে উঠল। বাঘ স্থির চোখে শিকারিকে দেখছে। বিশাল শরীর। মাটিতে লেজ আছড়াল বাঘ। সে খেপে যাচ্ছে। যে কোনও সময়ে ঝাঁপ দিতে পারে। ঘোড়ায় চাপ পড়ল। শব্দ হল ধুপ। রাইফেল গর্জন করতে ভুলে গিয়েছে? সেনবাবু বুঝলেন বৃষ্টির জলে টোটা ভিজে গিয়েছে। সেগুলো এই মুহূর্তে কোনও কাজে লাগবে না। অথচ সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ! বাঘ খেপে আছে। মাচান বেশি উঁচুতে নয়। ইচ্ছে করলে বাঘ লাফিয়ে উঠে আসতে পারে।

মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেলেন সেনবাবু। পাথরের মতো বসে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। শ্বাপদ তার নখ-দাঁত বার করবে এখনই। ফালা ফালা করে ফেলবে শিকারকে। শিকার এবং শিকারির ভূমিকা পালটে গিয়েছে। বাঘ ফের লেজ আছড়াল। একটা অস্ফুট ব্যঙ্গার্থক শব্দ করল। তারপর গম্ভীর চালে হেলেদুলে গভীর বনে ঢুকে গেল। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা একভাবে বসে থাকেন সেনবাবু। কী ঘটল, কেন ঘটল, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

ভোর হল। অসম্ভব কাঁপুনি দিচ্ছে শরীর। মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত সেই কাঁপুনি ঢুকে গিয়েছে।

ডুয়ার্সে বহু মানুষকে দেখেছি, যাঁরা শিকার করাকে পৌরুষের লক্ষণ বলে মনে করতেন। ডুয়ার্সের বীরপাড়া চা-বাগানে বাও করতেন অনাথবন্ধু গুহ। তাঁর ছেলে সুধাংশু গুহ। শিকার, শিকারি ও ডুয়ার্স নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ভদ্রলোকের কথা বলতেই হবে। সুধাংশু নামে তাঁকে কেউ চিনত না। তিনি পরিচিত ছিলেন পটুদা নামে। নামকরণ একদিক দিয়ে সার্থক ছিল। শিকারি হিসেবে তাবড় পটুত্ব অনস্বীকার্য। বাষট্টি-তেষট্টি সালের কথা। সে সময় বিন্নাগুড়ি অঞ্চলকে সাফ করার একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। বনকে কেটে ফেলার জন্য বন্য প্রাণীদের প্রভূত অসুবিধা হয়েছিল বলাই বাহুল্য। একটা বাঘ বন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এসে ঢুকে পড়েছিল দলমোর চা-বাগানে। খাদ্যের সন্ধানে অত্যাচার শুরু করেছিল। গোরু, মোষ, ছাগল নির্বিচারে হত্যা করেছিল। যখন মানুষের দিকে নজর পড়ল, তখন আর দাঁড়িয়ে দেখার সময় নেই। র‍্যাফ নামানোর মতো দশা। বাঘকে খুঁজে বার করাই হল সমস্যা। সে যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে! অবশেষে পটুবাবুর পটুত্ব দেখানোর সময় এল। ডাক পড়ল তাঁর। সে সময়কার ডুয়ার্সের চেহারাটা আজকের সঙ্গে মেলে না। বন ও প্রাণীর সহাবস্থান থাকলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ছিল আন্তরিক। দলমোর চা-বাগানে বাঘ ঢুকেছে— এই খবর ছড়িয়ে পড়ল হু হু করে। দ্বিতীয় খবর হল, বাঘ মারতে এসেছেন স্বয়ং পটু গুহ। খবর চলে গেল শিশুবাড়ির জোতদার মণ্ডল দাসের কাছে। তাঁর দুয়ারে তখন হাতি বাঁধা থাকে। চা-বাগানের গভীরে লুকানো বাঘকে পায়ে হেঁটে খোঁজা নিতান্তই বোকামির কাজ। তাই হাতি চলে এল পটু গুহর কাছে। হাতির পিঠে বসে পটু গুহ বাঘ খুঁজতে লাগলেন। তার আগে একটা কাজ করলেন তিনি। বাগানের যে রাখাল গোরু চরায়, তাকে বলে দিলেন সব ক'টা গোরুকে জঙ্গলে ছেড়ে দিতে। চা-বাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল গোরুগুলো। বাধাবন্ধনহীন গোরুদের স্বাধীনতা দেখার মতো হয়ে উঠল। তবে হ্যাঁ, পটু গুহর বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। দীর্ঘদিন

ধরে লুকিয়ে থাকা ক্ষুধার্ত বাঘ খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। আর শিকার কিন্তু শিকারি সম্পর্কে সজাগ হয়ে গিয়েছে। পশুর একটা আলাদা সেন্স থাকে। বাঘের গায়ের গন্ধ টের পেয়েছে গোরুগুলো। বিশেষ একটা জায়গায়, বিশেষ একটা ঝোপে তারা ঢুকতে চাইছে না। পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে পালাচ্ছে। এইটুকুই চেয়েছিলেন পটু গুহ। এর পর পটু গুহর গলায় আরেকটি সাফল্য পদক!

শৌখিন শিকারে আবার অনেকের মন। নির্মল বন প্রান্তরে রাইফেলের ঘোড়া টিপে একটা কাঠবেড়ালি কি বনমুরগি মারতে যত তৃপ্তি, তার একাংশ যদি প্রকৃতির রূপ দেখে হত! শিকারি আসে, শিকার করে, চলে যায়। আর আসে দালালরা। চা-বাগানের কয়লা সাপ্লাইয়ের কনট্যাক্ট নিতে আসে। কেউ আসে চা কিনতে, মাল বেচতে। সবাই কাজে আসে। সময় কোথায় অন্য কিছু ভাবার?

একবার ডুয়ার্সে এলেন এক ইঞ্জিনিয়ার। বিলেত ফেরত। মোটর থেকে নামলেন। সঙ্গে নামল হোল্ডঅল, জলের কুঁজো, বিরাট সুটকেস... ইত্যাদি। ঝরনা, পাহাড়, বন— কিছুই দেখার প্রয়োজন হল না তাঁর। সার্ভে টেবিল, লোহার শিকল, টাইপরাইটার আর অঙ্ক কষা— এই নিয়ে ব্যস্ত। সংগ্রহ করছেন নানা জায়গার পাথরের স্যাম্পল। সামনের ওই বিশাল পাহাড় তাঁর নজরে এল না, তা-ই কি হয়? ওই বিশাল স্তব্ধতাকে একবার বিস্ময়ে দেখবেন না? এরকম হয়?

হয় না! চোখের ঘন কাচের রোদচশমার আড়াল থেকে বনের সবুজ, আকাশের নীল, ঝরনার সাদা ফেনা— কিছুই তাঁর নজরে এল না। কিন্তু পাহাড়কে তিনি অবহেলা করেননি। একদিন পাখি-ডাকা সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে তাঁর মনে হল, ওই পাহাড়টাকে যদি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে হাজার টাকা আসবে। নতুন পথ নির্মাণ হবে। কম কথা নয়। তা ছাড়া টাকাটা কীভাবে আসবে, সেই গূঢ় তথ্য তিনি ভাঙেননি। ব্যবসার গূঢ় কথা ফাঁস করা ঠিক হত কি?

সেসব গল্প হারিয়ে যায়নি। বুনো পাখিরা, শাল-শিমুল ভরা বনস্থলী, নীলগাইয়ের দল, হরিণ, বাইসন, পাইথনের বংশপরম্পরায় সেই গল্প রয়ে গিয়েছে আজও! নিজেদের মধ্যে কথা হয়। ওরা বলে, শোনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবার হাসেও। হাসি আর দীর্ঘশ্বাস বার্তা হয়ে এক বন থেকে অন্য বনে পৌঁছে যায়। রোজ!

সাগরিকা রায়

জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সংস্থা

বনেদি শহর জলপাইগুড়ির অতীতের গরিমা ও আভিজাত্যের কথা সুবিদিত। খেলাধুলোতে, কৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে এই জেলা শহরের রমরমা ছিল একটা সময়। ফেলে আসা দিনগুলোতে খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জেলা অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। অন্যান্য খেলায় তো বটেই, ক্রিকেটেও এই শহরের ভূমিপুত্ররা নিজেদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের সৌরভ পৌঁছে দিয়েছেন বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তরে।

যাঁরা ক্রীড়ামোদী, তাঁরা অবগত আছেন, অতীতে ক্রিকেট মাঠে এই জেলার মুকুটে যুক্ত হয়েছে রংদার সমস্ত পালক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম সাফল্য এনেছে এই জেলা। একটা সময় ছিল, যখন কলকাতার মাঠে দাপিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন জলপাইগুড়ির ক্রিকেটাররা। রনজি ট্রফি খেলা বাংলা দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁরা লড়াই করেছেন বুক চিতিয়ে। এই জেলাই জন্ম দিয়েছে শংকর গুহঠাকুরতা, বাবলু বসুঠাকুর, মন্টু সান্যাল, দিলীপ বসু, অজয় দাশ, অরিন্দম গুপ্তর মতো অনন্য ক্রিকেটারদের, যাঁদের ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁদের উৎকর্ষর সংবাদ উত্তরবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার জেলায় জেলায়, এমনকি কলকাতার মাঠেও।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই আমাদের মনের মধ্যে এই অমোঘ প্রশ্নটা উঁকি মারছিল। আজ জলপাইগুড়ি জেলা অতীতের মতো উঁচু মানের খেলোয়াড়দের তৈরি করতে পারছে না। উঠে আসছে না কোনও নতুন প্রতিভা, যাঁরা এই জেলার সম্মান বাংলার বুকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কেন? কোথায় সেই প্রতিবন্ধকতা? সত্যিকারের প্রতিভা কি নেই এই জেলায়?

আমরা যারা অতীতে জলপাইগুড়ি জেলা দল এবং ক্লাবস্তরে দাপটের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি— আমরা কি পারি না নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কিছু ফিরিয়ে দিতে? আমরা কি পারি না উঠতি খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে আরও ধারালো করে তুলতে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই জন্ম হয়েছে জলপাইগুড়ি এক্স-ক্রিকেটারস অ্যাসোসিয়েশন-এর।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত প্রিয়জন, কাজের মানুষ অঞ্জন সেনগুপ্তর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল এইরকম একটি সংস্থার। প্রয়াত অঞ্জনদার উৎসাহে, পরামর্শে, অনুপ্রেরণায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে জন্ম হয়েছে জলপাইগুড়ির প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি এই সংস্থার।

এই সংস্থার লক্ষ্য বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্প, ক্লাব এবং বিদ্যালয় স্তর থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করা। শুধু তা-ই নয়, তাদের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উঁচু মানের ক্রিকেটার তৈরির বন্ধ হয়ে যাওয়া সাপ্লাই লাইন নতুন করে চালু করা। মূলত এটাই আমাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থার কাজ এগিয়ে চলেছে। সুখের কথা, জেলা ক্রীড়া সংস্থাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই সংস্থা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, এবং এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছে যে, প্রয়োজনে সবরকম সাহায্যের হাত তাঁরা বাড়িয়ে দেবেন। সদ্য জন্ম হওয়া এই সংস্থার এখনও অনেক পথ চলা বাকি। তবে লক্ষ্যে অবিচল থেকে জলপাইগুড়ি এক্স-ক্রিকেটারস অ্যাসোসিয়েশন যে সোজা রাস্তায় এগিয়ে চলবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লামা বাগচী

একটি ঘোষণা

এখন থেকে জনপ্রিয় নিয়মিত কলম 'ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স' প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। 'বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স' কলমটি প্রত্যেক মাসের প্রথম সংখ্যায় থাকবে। পাঠকের সহযোগিতা কামনা করি। ধন্যবাদসহ— **সম্পাদক**, 'এখন ডুয়ার্স'

গোয়েঙ্কা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পেল দেওয়ানহাটের কিশোর স্বর্ণদ্বীপ

গোটা বিশ্বের ফুটবল প্রায় তার নখদর্পণে। স্বপ্নের ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শয়নে-জাগরণে তার একটাই স্বপ্ন— বড় ফুটবলার হওয়া। স্বর্ণদীপের সেই স্বপ্ন এবার পূরণ হতে চলেছে। ফুটবল খেলতে চেনা মাঠ ছেড়ে কোচবিহারের কিশোর এবার পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সে যোগ দিচ্ছে এটিকে আরপি গোয়েঙ্কা রেসিডেনশিয়াল অ্যাকাডেমিতে।

আমাদের জীবন থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মাঠ। কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে চারদিক। তারপরও যেটুকু খোলা জায়গা বেঁচে আছে, সেখানে আর আগের মতো খুদেদের ফুটবল পেটাতে দেখা যায় না। খেলাধুলার বাণিজ্যিকীকরণের (বিশেষ করে ক্রিকেটের) দৌলতে ফুটবল তার গৌরব হারিয়েছে। যদিও ইদানীং আইপিএল-এর মতো আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালু হওয়াতে আবার বাঙালির পায়ে ফুটবল উঠে আসছে। এখন তারা ইলিশ-চিংড়ির ঊর্ধ্বে উঠে গলা ফাটাচ্ছে শুধু ফুটবল নিয়ে।

পেশাদার ফুটবলাররাও সুযোগ পাচ্ছে দেশের বিভিন্ন টিমে। আর্থিক দিক থেকেও আজ তারা অনেক বেশি নিরাপদ। ফলে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ দেখা দিচ্ছে নতুন করে। সাধারণত ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে আর্থিক কারণ ফুটবলারদের পক্ষে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায়, একটা বয়সের পর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তারা মাঠ থেকে হারিয়ে যায়। অনেক সময় টাকার জন্য খেপ খেলতে গিয়ে পায়ে চোট বা অন্য আঘাত পেয়ে সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবেই বাঙালির ফুটবল তার গতি হারিয়ে ফেলে।

নতুন প্রজন্মকে ফুটবলমুখী করতে এবং খেলাটা যাতে তারা ধরে রাখতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা ও কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গত মার্চ মাসে কোচবিহার স্টেডিয়াম অনূর্ধ্ব-১৪ বছরের ছেলেদের একটি ট্রায়াল ফুটবল সিলেকশন ক্যাম্প হয়েছিল। বিভিন্ন জেলাতেই এই উদ্দেশ্যে এ ধরনের ক্যাম্প হচ্ছে। তাতে প্রথম পর্বে অংশগ্রহণকারী ২১৫ জন ফুটবলারের মধ্যে

মাত্র ৮ জনকে বাছাই করা হয়। এর পর কলকাতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বাছাই পর্বে তাদের মধ্যে থেকে স্বর্ণদীপ সাংমা, পূর্বাথেলি শেরপা এবং রবীন লামা তৃতীয় পর্বে জায়গা করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একমাত্র স্বর্ণদীপই ফুটবল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবার ডাক পায়।

স্বর্ণদীপের বাবা দ্বীপেন্দ্র সাংমা জানালেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে কোচবিহার ছেড়ে চলে যেতে হবে কলকাতায়। সেখানে মাস দুয়েক ট্রেনিং-এর পর তার মতো আরও যেসব ছাত্র আছে, সকলকে নিয়ে যাওয়া হবে স্পেনে একটি বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য। পেশায় শারীরশিক্ষার শিক্ষক দ্বীপেন্দ্রবাবু নিজেও ফুটবল খেলতেন গোলরক্ষক হিসেবে। ছোট থেকেই বাবার গ্লাভসের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল স্বর্ণদীপের। বাজারে গেলেই একটা বল তার চাই-ই। স্কুলের হয়ে দৌড়ে স্টেট মিট, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট খেলেছে স্বর্ণদীপ, কিন্তু তাতে তার স্বপ্নপূরণ হয়নি।

ফুটবলে হাতেখড়ি বাবার কাছেই। বাবার মতো সেও গোলকিপার হয়েছে। পছন্দের গোলকিপার কে— এই প্রশ্নের উত্তরে একটুও না ভেবে তার জবাব, আর্জেন্তিনার রোমেরো। ফুটবল অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়ায় তার ফুটবল কোচিং থেকে শুরু করে পড়াশোনা— কোনও কিছুর জন্যই চিন্তা করতে হবে না স্বর্ণদীপের পরিবারকে। কারণ, এই অ্যাকাডেমি শুধুমাত্র ফুটবল ট্রেনিং-এর দায়িত্বই নিচ্ছে না, তাদের থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে পড়াশোনা ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের হাতে প্রতি মাসে একটা স্যালারি দেওয়া হবে বলে জানালেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মন। ইতিমধ্যেই ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে তাঁদের সমস্তরকম কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার দৌলতে এমন একটি সুযোগ পাওয়ায় স্বভাবতই খুশি ছোট্ট স্বর্ণদীপ। কিন্তু ছেলেকে ছেড়ে থাকার কথা মনে আসতেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে মায়ের। ছোট বোনের জন্য স্বর্ণদীপেরও একটু কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ফুটবলের আকর্ষণের কাছে তা কিছুই নয়।

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র স্বর্ণদীপের খেলা ট্রায়ালের দিনই নজর কেড়েছিল সবার— জানালেন বিষ্ণুব্রতবাবু। তিনি আরও বলেন, জেলায় এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। স্বর্ণদীপের এই সুযোগ পাওয়া জেলা ক্রীড়াক্ষেত্রে একটা বড় প্রাপ্তি। এই ট্রায়াল ক্যাম্পের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব ও এসএসএ-তে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সর্বত্র মাইকিং করা ও ব্যানারও লাগানো হয়েছিল। ফলে বিপুল সংখ্যক খুদে ফুটবলার এই ট্রায়াল ক্যাম্পে যোগ দিতে পেরেছিল। এ ছাড়াও অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার কোঅর্ডিনেটর আশিস সরকার ডিএসএ-র সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও ক্যাম্প করতে আগ্রহী বলে জানান তিনি।

স্বর্ণদীপের অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়া তাই তাদের কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি। যদিও জেলায় পর্যাপ্ত মাঠ নেই বলে একটা মাঠেই ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিক— সবকিছু করতে হয় তাঁদের। যদি আরও মাঠ পাওয়া যেত, তবে ফুটবলের উন্নতিতে আরও সুবিধা হত বলে দাবি করেন বিষ্ণুবাবু। সে যা-ই হোক, ফুটবলের সোনার দিন আবার ফিরে আসুক, মাঠ থেকে স্বর্ণদীপের মতো আরও নতুন ফুটবলার উঠে আসুক। খুদে ফুটবলারদের স্বপ্নপূরণ হোক এভাবেই।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কে হবেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ?

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব অঞ্জন সেনগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন সম্প্রতি। এবার তাঁর ছেড়ে যাওয়া কুর্সিতে বসার জন্য অঞ্জনের একদা দুই বিশ্বস্ত সহচরের মধ্যে শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার লড়াই। যার একদিকে ভোলা মণ্ডল, অন্য দিকে কুমার দত্ত।

অবশ্যম্ভাবী ঘটনার সূত্রপাত অঞ্জন সেনগুপ্তর প্রয়াণের পর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসে। অঞ্জন যে চেয়ারে বসতেন, সেই চেয়ারটিতে তাঁর সম্মানে তাঁরই একটি ফোটো সাজিয়ে রাখা ছিল। এদিকে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি, যিনি শাসকদলেরই এক দুঁদে নেতা, তিনি কিছুদিন আগে এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। অঞ্জনের ছবি সরিয়ে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল সেই চেয়ারে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিবাদ। ভোলা মণ্ডলকে উদ্দেশ্য করে কুমার দত্ত যে বাক্যবাণ ছাড়েন, তাকে সুমধুর বলা যাবে না কিছুতেই। পরে অবশ্য কুমার দত্ত ভুল স্বীকার করেন।

এর পর 'প্যানেল' জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভোলা মণ্ডলকে সর্বসমক্ষে অপমান করেন কুমার দত্ত এবং ওই প্যানেল বাতিলও করতে বলেন। এই নিয়ে শুরু হয় আর এক প্রস্থ লড়াই। বাগ্‌বিতণ্ডার পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কে হবেন, সেটা বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত হবে।

এই ঘটনার পর তৈরি হয়ে যায় দু'টি আলাদা দল। কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, ডিএসএ-র অফিস বেয়ারার থেকে শুরু করে কর্মচারীরা রয়েছেন ভোলা মণ্ডলের গ্রুপে। ওদিকে অবার কুমার দত্তর মাথার ওপর আশীর্বাদি হাত আছে শহরের বেশির ভাগ ক্লাবের। ফলে আগামী দিনে কে হবেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব তা নিয়ে ক্রীড়ামহলে চলেছে চাপানউতোর।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

রাজ্য অ্যাথলিটে কোচবিহারের সোনা, আলিপুরদুয়ারের রুপো ও ব্রোঞ্জ

কলকাতার সাই কমপ্লেক্সে রাজ্য অ্যাথলিটের ৬৬তম আসরে সোনা পেল কোচবিহারের সৌরভ সাহা ও তাজিনুর আলি। ১০ জনের একটি দল পাঠিয়েছিল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এতে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ২০০ মিটার দৌড়ে সোনা ও ১০০ মিটারে রুপো জিতেছে সৌরভ। এ ছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৬-তে লং জাম্পে পুরুষ বিভাগে তাজিনুর সোনা ও অনূর্ধ্ব-১৪ শর্টপাটে রাহুল হক ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ওই মিটে ১০০ মিটারে আলিপুরদুয়ার জেলার অনূর্ধ্ব-১৬ পুরুষ বিভাগে অনির্বাণ কিসকু দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক এবং মহিলা বিভাগে ডিসকাস ছুড়ে ক্যামেলিয়া রায় তৃতীয় স্থান পেয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস, পরিতোষ সাহা

আলিপুরদুয়ার ফুটবল লিগ

১-১৫ জুলাই পর্যন্ত গ্রুপ 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি'-র অন্তর্ভুক্ত দলগুলির ক্রীড়াসূচি

গত সংখ্যার পর

গ্রুপ এ— ১) বিধানপল্লি ক্লাব, ২) কামাখ্যাগুড়ি ইউথ ক্লাব স্পোর্টস ক্লাব ইনস্টিটিউট, ৩) ডুয়ার্স স্পোর্টিং ক্লাব, ৪) বাঞ্ছুকুমারী, গ্রিন ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৫) সব্যসাচী ক্লাব, ৬) দমনপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, দমনপুর, ৭) গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৮) আশুতোষ ক্লাব, ৯) বাবুরহাট স্পোর্টিং ক্লাব, বাবুরহাট।

৫ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ১ বনাম ৪-এর খেলা। ৭ জুলাই রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৫ বনাম ৭-এর খেলা। ৯ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ৭ বনাম ১-এর খেলা। ১১ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ৯ বনাম ৩-এর খেলা। ১৩ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ২ বনাম ৬-এর খেলা। ১৫ জুলাই কামাখ্যাগুড়ি ময়দানে ২ বনাম ৩-এর খেলা।

গ্রুপ বি— ১) আদিবাসী নবজাগরণ, দক্ষিণ পানিয়ালগুড়ি, ২) বিবেকানন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৩) কদমপুর রেনবো আদিবাসী কালচারাল সোসাইটি, শামুকতলা, ৪) নবীন সংঘ পলাশবাড়ি, ৫) ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি, ঘাগরা, ৬) ডুয়ার্স সকার ক্লাব, মেচপাড়া টি ই কালচিনি, ৭) প্যারেড গ্রাউন্ড প্লেয়ার্স ৮) ফস্কাডাঙা আদিবাসী রাখাল ক্লাব ও পাঠাগার, ফস্কাডাঙা।

৩ জুলাই ভিএনসি ময়দানে ১ বনাম ৪-এর খেলা। ৫ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ৫ বনাম ৭-এর খেলা। ৭ জুলাই ভিএনসি ময়দানে ৭ বনাম ১-এর খেলা। ৯ জুলাই ভিএনসি ময়দানে ২ বনাম ৬-এর খেলা। ১১ জুলাই কামাখ্যাগুড়ি ময়দানে ২ বনাম ৩-এর খেলা। ১৩ জুলাই রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৫ বনাম ১-এর খেলা। ১৫ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ৬ বনাম ৮-এর খেলা।

গ্রুপ সি— ১) সূর্য সেন ফুটবল অ্যাকাডেমি, আলিপুরদুয়ার, ২) যুব সংঘ, ৩) বলাই মেমোরিয়াল ক্লাব, ৪) সূর্যনগর ক্লাব, ৫) কালচিনি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, ৬) সুভাষপল্লি কালচারাল ক্লাব, ৭) স্বাধীন ভারত ক্লাব ৮) মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

২ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ১ বনাম ৪-এর খেলা। ৪ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ৫ বনাম ৭-এর খেলা। ৬ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ৭ বনাম ১-এর খেলা। ৮ জুলাই কামাখ্যাগুড়ি ময়দানে ২ বনাম ৬-এর খেলা। ১০ জুলাই ভিএনসি ময়দানে ২ বনাম ৩-এর খেলা। ১২ জুলাই রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৫ বনাম ১-এর খেলা। ১৪ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ৬ বনাম ৮-এর খেলা।

গ্রুপ ডি— ১) উদয় স্পোর্টিং ক্লাব, ২) দাওমারু ক্লাব, মারা খাটা, ৩) বাবুপাড়া ক্লাব, ৪) সাউথ বয়েজ ক্লাব, ৫) টাউন ক্লাব, আলিপুরদুয়ার, ৬) রাজাভাত স্পোর্টিং ক্লাব, রাজাভাতখাওয়া, ৭) স্বামীজি ক্লাব, বেলতলা, ৮) রবীন্দ্র সংঘ।

২ জুলাই ভিএনসি ময়দানে ৫ বনাম ৭-এর খেলা। ৪ জুলাই সূর্যনগর ময়দানে ৭ বনাম ১-এর খেলা। ৬ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ২ বনাম ৬-এর খেলা। ৮ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ২ বনাম ৩-এর খেলা। ১০ জুলাই টাউন ক্লাব ময়দানে ৫ বনাম ১-এর খেলা। ১৪ জুলাই রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৮ বনাম ১-এর খেলা।

প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৪টে থেকে

বই পত্রের ডুয়ার্স

প্রসঙ্গ কোচবিহার

প্রয়াত নীরজ বিশ্বাস আমৃত্যু ছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা। নিজের শহর নিয়ে নানা সময়ে তিনি বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে লিখেছিলেন। তাঁর সেইসব লেখা 'প্রসঙ্গ কোচবিহার' বইতে সংকলিত হয়েছে লেখকের কন্যা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের উদ্যোগে। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৬৮-২০০০। লেখাগুলির মধ্যে কোচবিহারের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় যেমন এসেছে, তেমনই এসেছে স্মৃতি, ভাল লাগা, অভিমানের কথাও। সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের সুন্দর মিশেলের কারণে পড়তে বেশ লাগে। রাসমেলা, মদনমোহন, পুজোর স্মৃতি, কামেশ্বরী মন্দির, রবিন সাহেব— এমন অনেক বিষয় আছে, যা কোচবিহারের নিজস্ব। পাশাপাশি বিন্দুতে বনভোজনের কাহিনি কিংবা জলদাপাড়ার প্রাণীনিবাসের কথা, এমনকি অ-কোচবিহার সংক্রান্ত রচনাও স্থান পেয়েছে। বস্তুত, সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে যখন যেমন দরকার হয়েছিল, তেমনই লিখেছিলেন নীরজ।

তবে কোচবিহারের প্রতি হৃদয়ের টান সুযোগমতো প্রতিফলিত হয়েছে বইটির পাতায়। বোঝাই যায় যে, নিজের শহর নিয়ে তাঁর অনেক ভাবনা, স্বপ্ন এবং সেহেতু অভিমানও ছিল প্রবল। প্রতিটি রচনাই নাতিদীর্ঘ এবং সুপাঠ্য। ১৯৬৮ সালে জলদাপাড়া টুরিস্ট লজের ভাড়া ২৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫ টাকা। কিন্তু তখনও বিদ্যুৎ আসেনি। এই তথ্য জানা যায় প্রথম রচনাটি থেকে। ওই বছরই বিন্দুতে পিকনিক করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আর সদ্য গড়ে ওঠা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঘিরে লেখকের আশার কথা শুনি 'বিন্দু থেকে বিদ্যুৎ' রচনায়।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসের নামগুলি 'কাব্যিক' হতে যাচ্ছে কিংবা কোচবিহারের সংগীত কলকাতায় রেডিয়ো-রেকর্ডে বিকৃতভাবে পরিবেষিত হওয়ার কারণে স্থানীয় সংগীতরসিকের আক্ষেপ— ইত্যাদি হরেক ছোট ছোট বিষয় ধরা পড়েছে সংকলনটির বিভিন্ন লেখায়। 'কোচবিহারের চিঠি' শীর্ষক রচনাগুলি ওই শহরের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে উসকে দেবে নিঃসন্দেহে।

অন্য দিকে, 'শুধু ভালোবাসা' লেখাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে কোচবিহারের ফুটবল নিয়ে নীরজের আক্ষেপ। এর ঠিক আগের লেখাটির বিষয়বস্তুও শহরের ফুটবল, যেখানে উচ্চারিত হয়েছে স্থানীয় ফুটবলের হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বল নামগুলি। 'খেলার মাঠে দর্শক' রচনায় মিশে রয়েছে নীরজের ব্যক্তিগত স্মৃতি। মোহনবাগানের গ্যালারিতে বসে ইস্ট বেঙ্গলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হওয়ার দরুন খুব মার খেয়েছিলেন একদিন।

বস্তুত কোচবিহারের খেলাধুলো নিয়ে পরপর কয়েকটি রচনা পড়ার পর মনে হয় যে, নীরজ সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি ক্রীড়া বিষয়েও প্রবল উৎসাহী ছিলেন। কোচবিহার যে একদা ক্রীড়াক্ষেত্রে

কোচবিহারের প্রতি হৃদয়ের টান সুযোগমতো প্রতিফলিত হয়েছে বইটির পাতায়। বোঝাই যায় যে, নিজের শহর নিয়ে তাঁর অনেক ভাবনা, স্বপ্ন এবং সেহেতু অভিমানও ছিল প্রবল। প্রতিটি রচনাই নাতিদীর্ঘ এবং সুপাঠ্য। কোচবিহারের মানুষ হিসেবে নীরজের মনে বেশ তৃপ্তি ছিল।

আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছিল, তা নীরজ বারবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে। পাশাপাশি, কোচবিহারের ক্ষয়ে যাওয়া নীরজকে কতটা বিচলিত করছে, তার প্রমাণও পাওয়া যাবে। এই বিচলন আসলে শহরের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের কারণে।

কোচবিহারের মানুষ হিসেবে নীরজের মনে বেশ তৃপ্তি ছিল। বইটির প্রায় সব রচনায় বাংলার ইতিহাসে উপেক্ষিত এই রাজ্যটির প্রতি তাঁর অন্তরের টান ধরা পড়ে। ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রায় চার দশকের কোচবিহার অল্প অল্প করে ধরা পড়েছে এই সংকলনে। তার মধ্যে আছে খেলা, নাটক, গান, পত্রপত্রিকা, সাহিত্যচর্চা, এমনকি ভূতনাথের সানাই পর্যন্ত!

নীরজ নিজে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের পদস্থ কর্মী ছিলেন দীর্ঘদিন। ওই সংস্থার অবক্ষয়ের আভাসও ধরা আছে 'অথ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ' শীর্ষক রচনাটিতে। সেখানে লেখক সখেদে বলেছেন, 'যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে ইউনিয়নের কর্তৃত্ব চলছে। কেবল হাত বদলে এখন অন্য ইউনিয়ন এসেছে মাতব্বরিতে। ফলে পূর্ববর্তীরা যা করেছেন, এঁরা তার চাইতেও এক ডিগ্রি উপরে উঠতে চেষ্টা করছেন। নিজেদের সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিবহণের সমূহ ক্ষতি হলেও তাঁরা অনেক সময় চেয়ে দেখেননি। হয়ত ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়নের ধারাই এমন।' এই লেখার প্রকাশকাল অনুল্লিখিত। এইরকম বেশ কয়েকটি রচনার প্রকাশকাল অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত জানাই যে, গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো নেই।

ডুয়ার্স নিয়ে আগ্রহী পাঠকরা বইটি পড়তে পারেন এবং কোচবিহারের পুরনো মানুষমাত্র বইটি পড়তে পড়তে যে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হবেন তা বলাই বাহুল্য। সাংবাদিকতার দাবি মানতে গিয়ে নীরজ কোনও কোনও লেখায় কেবল তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু এমন অনেক রচনা আছে, যেগুলি সংবাদভিত্তিক সাহিত্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত। যেমন 'প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ'।

সুন্দর কাগজ, ভাল ছাপা আর বাঁধাই বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিঃসন্দেহে। নীরজ বিশ্বাস কোচবিহার সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের একজন পুরোধা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমকালীন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক রথী-মহারথীর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন নাট্যামোদী। তবে আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ বইটি সেই গোত্রের নয়। কিন্তু তিনি যে সুলেখক ছিলেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হবে না। প্রিন্ট মিডিয়ার নবীন সাংবাদিকরাও বইটি পড়লে উপকৃত হবেন।

'কোচবিহার প্রসঙ্গে', নীরজ বিশ্বাস,
পত্রলেখা, কলকাতা। দাম ১৫০ টাকা

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

নীর

সাবালকত্বপ্রাপ্তির আনন্দে নীলাব্জ নিয়োগী ও রঙ্গন রায় 'নীর' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে সম্প্রতি। ক্ষীণ আয়তনের প্রথম সংখ্যায় কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। বেশ লাগল দীপঙ্কর লাল ঝা-র লেখা 'হাতা খুন্তি দেখে মনে হয়/ কতবার জন্ম নিতে নিতে/ হাঁফিয়ে গিয়েছেন মা।' তপেশ দাশগুপ্তর কবিতাটি মনোগ্রাহী। অনুপম মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুদ্র গদ্যে দাবি করেছেন, 'একজন পুনরাধুনিক কবি কোনও প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হবেন না। আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবেন।' নীলাব্জ আর রঙ্গনের ছোট্ট দু'টি গদ্য মন্দ হয়নি। তবে পত্রিকাটি আরও সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করা যেত।

রজত অধিকারী

শ্রীমতী ডুয়ার্স

দু'চাকায় পাহাড়-মরুভূমি দাপিয়ে বেড়ায় সংঘশ্রী

ছোট্ট সংঘশ্রী নারকেল গাছে শুয়ে যখন দোল খেত, পাশের বাড়ি থেকে নালিশ জানাত গুরুজনরা। ছোটবেলা থেকেই বড় ডানপিটে মেয়েটা। ইশকুলের পড়াশোনায় মন ছিল না মোটেই। তা-ই নিয়ে মায়ের মনে ছিল অশান্তি। কিন্তু তা নিয়ে সংঘশ্রীর কোনও মাথাব্যথা নেই। আসলে বাঁধাধরা ছকে চলার মেয়েই নয় সে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন চলে যেতে চাইত পাহাড়ে, নদীতে, সমুদ্রে, সমগ্র প্রকৃতির রাজ্যে। বেশ খানিকটা বড় হওয়ার পর ভাবতে লাগল, একটা মোটরবাইক থাকলে মন্দ হত না। বাবাকে রাজি করানোটা খুব ঝামেলার। অন্য সব বাবা-মায়ের মতো তাঁরাও যে নিজের মেয়ের জন্য একই ভাবনা ভাবেন। কিন্তু সংঘশ্রী নিজেকে মেয়ে বলে ছেলেদের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারত না। ছেলেরা পারলে সে কেন পারবে না, এমন ভাবনাই ওকে তাড়িয়ে বেড়াত। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মোটর সাইকেলের একটা ব্যবস্থা হল। একেবারে নিজের হল না ঠিকই, কিন্তু বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা তাতে পূরণ করা গেল। ব্যাস, তাকে আর পায় কে! বাইক নিয়ে পাহাড়ে চড়া নেশার মতো পেয়ে বসল সংঘশ্রী রায়কে।

২০১৪-র সেপ্টেম্বর মাসে সংঘশ্রী রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করল লে-র উদ্দেশে। হায়দরাবাদ থেকে আরও দুই বন্ধু সঙ্গী হল। বাইক নিয়ে সবাই মিলে রওনা হল দিল্লি থেকে উদমপুর হয়ে কাশ্মীরের পথে। সেখান থেকে পৌঁছাল দ্রাস। ওখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ২৫০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাল লামাইউরু। মুনল্যান্ড বলেও পরিচিত লামাইউরু। পাঁচশো বছরের পুরনো একটি মনাস্ট্রি আছে সেখানে। একটু বেড়িয়ে ফের বেরিয়ে পড়া, ২৭৫ কিমি দূরে লে-র দিকে। ওই পথে চাঞ্চল্যকর ও আকর্ষণীয় বিশেষত্ব আছে, যা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পথটি খানিক চড়াই, যে অংশের পুরোটাই নাকি ন্যাচারাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ফলে, বাইক না চালালেও তা নিজে থেকেই তরতরিয়ে উঠে যায় উপরে। অবাক করা সেই রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে লে পৌঁছানো গেল। পরদিন লে থেকে বেরিয়ে চাংলা পাস পেরিয়ে সংঘশ্রীরা গেল প্যাংসাংলো লেক। তারপর আবার ফিরে যাওয়া লে-তে। ঠান্ডার বর্ণনা দিতে গিয়ে সংঘশ্রী জানাল, ওটাকে ঠিক শীত বলে না বোধহয়। মাথার উপর বরফের কুচি পড়ছিল, সারা শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় মনে হচ্ছিল, আর বোধহয় এ যাত্রায় বেঁচে ফেরা হল না। তবু এগিয়ে চলার সুতীব্র বাসনা আর মনের জোর সম্বল করে কাটতে লাগল দিন।

পরদিন লে থেকে বেরিয়ে খারদুংলা পাস হয়ে হুন্ডর। এখানেও আবার অবাক- করা দৃশ্য। হুন্ডর এমন একটি জায়গা, যেখানে একই সঙ্গে মরুভূমি, নদী আর বরফের পাহাড়ের সহাবস্থান। মাঝখানে গরম বালি, সেখানে ঘুরে

বেড়াচ্ছে ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল। পাশাপাশি যে পাহাড়গুলো ঘিরে আছে, সেগুলো সব বরফে ঢাকা। কাছেই বয়ে চলেছে নদী। তাপমাত্রার এমন অদ্ভুত সমাবেশ দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। এ কোন স্বর্গরাজ্য এমনটাই মনে হয়। ধাতস্থ হতে সময় লাগে। হুন্ডরের কাছাকাছি একটি উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করে সবাই। আবার লে-তে ফিরে এসে একটা দিন কাটিয়ে পরদিন ওরা চলে যায় সোমেরেরি লেক। সেখানে হোমস্টেতে থাকা, পরদিন রওনা মানালির পথে।

সারচুতে রাত কাটিয়ে পরের দিন মানালি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুইটজারল্যান্ডের ছবি। সম্পূর্ণ যাত্রাপথে মোট দশটা পাস পেরতে হয়। এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের অভিজ্ঞতা। সব থেকে কঠিন ছিল রোটাং পাস। কাদায় গাড়ি চালানোর তো প্রশ্নই ওঠে না, হেঁটে ওঠাও অসম্ভব। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। অগত্যা বাইক ঠেলে ঠেলে উপরে ওঠা। সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

সংঘশ্রী জানায়, পুরো জার্নিটাতে রোটাং পাসের মতো পথ আর কোথাও ছিল না। তারপর কুলু-মানালি হয়ে দিল্লি ফিরে একেবারে জলপাইগুড়ি। ওই অভিজ্ঞতার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যেমন কঠিন, এ নেশাও তেমনই সাংঘাতিক। ফিরে এসে বারবার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ২০১৬-র জুনে সংঘশ্রী আবার বেরিয়ে পড়েছে হিমাচলপ্রদেশের উদ্দেশে। ফিরতে ফিরতে জুনের শেষ। তারপর হয়ত আবার অন্য কোথাও। এভাবেই ছুটে চলবে সে বিরামহীন অবিরত।

শ্বেতা সরখেল

রূপসী ডুয়ার্স

গরমে ত্বকের যত্ন

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

ছয় ঋতুর ছায়া জালে বসুন্ধরাকে যেমন ধরা দিতে হয়, সেই ছায়া জালে মানুষের জীবনকেও ধরা দিতে হয়। এই ঋতুর কালচক্রও আমাদের ত্বক, চুল, খাওয়াদাওয়া, পড়ার উপর জীবনের ছায়া ফেলে।

যেমন গ্রীষ্মকালের তাপদাহে আমাদের চুল, ত্বক, সবসময় ঘেমে চিটচিটে হয়ে থাকে। তার ফলে চুল পড়তে থাকে। ত্বকে দেখাযায় open pores নানারকম র‍্যাশ, লাল ভাব আর একটা বড় সমস্যা Sun Tan।

এর থেকে বাঁচতে বারবার মুখ পরিষ্কার করতে হবে, বারবার জল দিয়ে মুখ ধোবেন। দিনে দু'বার ফেশ ওয়াশ বা ফেশ ক্লিনজার ব্যবহার করবেন। ঘরোয়া পদ্ধতিতেও পরিষ্কার করতে পারেন যেমন— আটা, চিনি, গোটা পোস্ত, গোলাপ জল এবং শশার রস দিয়ে মিশিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে দিন। ৪/৫ মিনিট রেখে ভেজা হাতে খুব হালকা ভাবে ঘষে তুলে দেবেন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দেবেন। এরপর টোনার ব্যবহার করবেন। টোনার ফ্রিজে রাখবেন। ভেজা তুলোতে টোনার নিয়ে ড্যাব করে লাগান। এর ফলে মুখ ঘেমে যাওয়া ধীরে ধীরে কম হবে।

ঘরোয়া টোনার বানাতে পারেন যেমন তরমুজের রস, শশার রস এবং এক চিমটি কর্পূর মিশিয়ে লাগাতে পারেন। লাগাবার ১০/১৫ মিনিট আগে বানাতে হবে। এটা ঠান্ডা লাগাতে পারলে ভাল। পুদিনাপাতার রসও টোনারের কাজ করে। যদি স্কিনে র‍্যাশ হয় বা সব সময় থাকে তাহলে দু'গ্লাস জলে ১০/১৫ টা লবঙ্গ ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তার সাথে এক চিমটি কর্পূর মিশিয়ে ব্যবহার করলে এর থেকে রেহাই পেতে পারেন। গ্রীষ্মকালে একটা সমস্যা ত্বকে ট্যান হওয়ার থেকে বাঁচতে সান স্ক্রিন লাগাতে হবে। সান স্ক্রিন লাগাবার আগে আপনি আপনার ত্বক সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নিন। ত্বক অনুসারে সান স্ক্রিন পাওয়া যায়। সান স্ক্রিন ড্যাব করেই লাগাতে হবে এবং বাইরে যাবার ১০/১৫ মিনিট আগে লাগাতে হবে। ঘরোয়া পদ্ধতিতেও ট্যান দূর করতে পারেন। কেশর দুধে বা দইয়ে ভিজিয়ে রেখে পাউরুটির সাথে মিশিয়ে লাগিয়ে রাখুন অথবা মিল্ক পাউডারের সাথে শশার রস ও মধু মিশিয়ে লাগাতে পারেন। এইগুলি ১০/১৫ মিনিট লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চুলের জন্য ও চুল অনুযাই শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

একদিন বাদ একদিন বাদ শ্যাম্পু করুন, দরকার হলে রোজ শ্যাম্পু করুন। এতে মাথা ঘামার সমস্যা দূর হবে। যদি খুব তেলতেলে হয় তবে ডিমের সাদা অংশ অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে শুধু মাথার তালুতে লাগান। ১৫/২০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে শ্যাম্পু করুন।

এছাড়া খাবারের দিকে নজর দিতে হবে। প্রচুর জল ও জ্যুস পান করতে হবে। টক দই, ফল খান নিয়মিত। তৈলাক্ত খাবার কম খেতে হবে। আর সব সময় ব্যবহার করতে হবে সানগ্লাস ও ছাতা। ত্বক ভাল রাখতে রোজ যোগাসন করুন। মন ভালো রাখুন আনন্দে থাকুন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

AANGONAA

Ladies Beauty Clinic

Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional

7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001 Satyajit Sarani, Shivmandir

Call : 9434176725, 9434034333

শতবর্ষে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রথম বিদ্যালয়

পশ্চিমবাংলার নবীনতম জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর আলিপুরদুয়ার জেলার প্রথম বিদ্যালয় হিসেবে একশো বছরে পদার্পণ করার গৌরব অর্জন করেছে আলিপুরদুয়ার হাই স্কুল। ১৯০৪ সালে সংলগ্ন ভাটিবাড়ি থেকে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গুটিকয় আসবাবসহ আলিপুরদুয়ার পেরিয়ে ফালাকাটার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, স্থানীয় কিছু বিদ্যোৎসাহীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে স্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে তা শহরের বাবুপাড়া এলাকায় স্থানান্তরিত হয়ে আজকের এই বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত।

পরাধীন দেশের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা একটি পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয় ও মহৎ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করেছিলেন যাঁরা, তাঁরা কেউই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। নিছক জীবিকা নয়, সমাজসেবার ব্রত নিয়ে সামান্য বেতনের বিনিময়ে, ক্লেশ সহ্য করে, শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে যেভাবে তাঁরা পাঠদান করেছেন, আজকের প্রজন্ম তার যথাযথ মূল্যায়নে সক্ষম হবে কি না তা বলা দুরূহ।

এই বিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি, আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি বিনম্র তর্পণ হিসেবে বিদ্যালয়ের একশত বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করার কথা ভাবা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণের জন্য উপসমিতিগুলিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর্থিক সহায়তা আহ্বানের লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সহৃদয়তায় একটি অনুরোধপত্র বিলি করা হয় শহরে। এগিয়ে আসেন যুগোপযোগী প্রচারে সহায়তাদানকারী অন্তর্জাল ব্যবহারকারীরা।

অবশেষে এসে পড়ল ৩০ সেপ্টেম্বরের শুভ প্রত্যূষ। এক বিশাল, সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সাক্ষী হয়ে রইল সমগ্র আলিপুরদুয়ার শহর। শতবর্ষের 'লোগো' নামাঙ্কিত বিশেষ পোশাকে সজ্জিত একশত ছাত্র রঙিন পতাকাদণ্ড নিয়ে পদযাত্রার সামনের সারিতে থাকে, সঙ্গে থাকে মিউজিক্যাল ব্যান্ড। স্থানীয় আদিবাসীদের মাদল সহযোগে নৃত্য, বিদ্যালয়ের ট্যাবলোর সঙ্গে মাঙ্গলিক গানের দল, পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের বর্ণময় উপস্থিতি, বর্তমান ছাত্রছাত্রী, লালপাড় সাদা শাড়িতে অভিভাবিকাবৃন্দ, মার্জিত বেশভূষায় বর্তমান অভিভাবকবৃন্দ, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, স্থানীয় উৎসাহী মানুষ—সকলের সমাবেশে প্রায় তিন সহস্রাধিক মানব-মানবীর এক সাড়ম্বর শহর পরিক্রমা। প্রখর দাবদাহকে উপেক্ষা করে কতশত মানুষ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসাহদান করেছেন, মোড়ে মোড়ে শীতল পানীয় জল সরবরাহ করেছেন। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে। সূচনা করেন মনীষী পঞ্চানন বর্মা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শুভ্রাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শংকর চক্রবর্তী মহাশয়। তদানীন্তন স্থানীয় বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান ড. সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ। এর সঙ্গে উপস্থিত দু'জনের ব্যক্তিত্বের উল্লেখ না করলেই নয়। বাংলার যশস্বী চিকিৎসক ড. মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক ড. পবিত্রনারায়ণ মজুমদার আবেগঘন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সকলের হৃদয়াভিষিক্ত হন। এই দুই বরেণ্য প্রাক্তনীর উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত, উদ্‌বেলিত করেছে।

সে দিন সন্ধ্যায় মুখ্য পরিবেশন ছিল পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের ছৌ-নৃত্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'। লোকসংস্কৃতির এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই নৃত্যকলা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের তন্ময় করে রেখেছিল।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১ অক্টোবর, সকাল ১০টা থেকে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের অনেকে, প্রাক্তনী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী মিলিয়ে প্রায় আশিজন রক্তদান করেন। নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত কুইজ প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত আকর্ষক ও উপভোগ্য রূপ নেয়। শতবর্ষের থিম সং রূপায়ণের দায়িত্ব যাদের অর্পণ করা হয়েছিল, প্রাক্তন ছাত্রদের গানের দল 'পুরনো গিটার' এ দিন সন্ধ্যায় তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এই সঙ্গে শেষ হয় এ পর্বের অনুষ্ঠানমালা।

১২ ডিসেম্বর ২০১৫ মিউনিসিপ্যালিটি হলে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সুবীর সরকার, ড. সুচন্দ্রা দত্ত ও ড. সংগ্রাম বাগ শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

৪ জানুয়ারি ২০১৬ সাড়ে সাতটায় ইনডোর স্টেডিয়াম চত্বর থেকে 'শতবার্ষিকী দৌড়' আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানসূচির সূত্রপাত হয়। ৫ ও ৬ জানুয়ারি জেলার আটটি স্কুলকে নিয়ে অনূর্ধ্ব উনিশ ফুটবল প্রতিযোগিতা ও আলিপুরদুয়ার একাদশ বনাম কোচবিহার একাদশের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত হয়। ৯ জানুয়ারি মরশুমের শীতলতম সকালে প্রায় তিনশতাধিক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে আয়োজিত হয় 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'। অঙ্কন সামগ্রী প্রস্তুতকারক সংস্থা ককুও ক্যামলিন-এর আর্থিক সহায়তায় সে দিনই আয়োজিত হয় 'আর্টিস্ট ওয়ার্কশপ'। প্রাক্তনী দুই অ্যামেচার শিল্পীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় আয়োজিত চিত্রকলা প্রদর্শনী, সিরিয়াস

অ্যামেচার কয়েকজন প্রাক্তনী আয়োজিত ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনী ও উৎসাহী এক প্রাক্তনীর প্রায় একক প্রচেষ্টায় স্থানীয় ক্রীড়াজগতের একটি ঐতিহাসিক উপস্থাপনা সকলকে মুগ্ধ করে।

যে বিশেষ উপলক্ষটিকে কেন্দ্র করে আমরা বিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত ছিলাম, সেটি হল 'পুনর্মিলন'। ১০ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে প্রাক্তন ছাত্রদের নাম নথিভুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে অশীতিপর ও সত্তরোর্ধ্ব প্রাক্তনীরা একে একে এসে বসেন। স্কুলজীবনের সহপাঠীদের কাছে পেয়ে আবেগমথিত স্মৃতিচারণা ও আনন্দাশ্রু বিনিময় দিয়ে শুরু করেন। এই অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় স্মৃতিবিজড়িত লেখালেখি সংবলিত শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা 'স্মৃতিমাল্য'র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের শিল্পী সমন্বয়ে মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত তথ্যচিত্র 'একাল ও সেকাল' প্রদর্শিত হলে উচ্চপ্রশংসিত হয়। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় দু'টি পূর্ণাঙ্গ নাটক— স্থানীয় সঙ্ঘশ্রী নাট্যগোষ্ঠী অভিনীত 'সাকিন' ও কসবা তিলজলা নাট্যগোষ্ঠী অভিনীত 'রাজা সাজার সাজা'। একটি সন্ধ্যা নাটকের জন্য নিবেদিত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা এই অভিনয় দু'টির আয়োজন করে আমাদের প্রতিশ্রুতিপূরণে সহায়ক হয়েছেন। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে প্রদর্শনীস্থলে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতামালায় বীর সন্ন্যাসীর জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাদর্শ আলোচিত হয়। বিকেলে মূল মঞ্চে বিদ্যালয়ের 'বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ' অনুষ্ঠিত হয়। এই সন্ধ্যায় আত্মপ্রকাশ করে বিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা 'নবার্ক'।

অজস্র প্রাক্তন ছাত্রর আন্তরিক সাহচর্য, নিরন্তর সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানে আমাদের সেরা প্রাপ্তি। শ্রম দিয়ে, উপস্থিতি দিয়ে, ব্যক্তিগত স্তরে অর্থসাহায্য করে, বিদ্যালয়ের উপযোগী কোনও সামগ্রী দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের ধন্যাবাদার্হ হয়েছেন। যাঁদের কাছে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছাতে পারিনি, তাঁরাও প্রত্যাশার অতিরিক্ত সংখ্যায় যোগদান করে এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

শান্তনু দত্ত

ভাবনা বাগান

শুধু ইচ্ছেটুকুই সম্বল

'...মোটা মোটা সবরী কলা/ বিন্নি ধানের খই...' সেই সকাল থেকে ছড়ার লাইনগুলো মাথায় ঘুরছে আর এ বাজার-সে বাজার ঘুরছি, একে-তাকে জিজ্ঞেস করছি। যে বিন্নি ধান আজও চিনিনি। আর সবরি কলা বলতেই চোখের সামনে পাকা মর্তমান কলা ঘুরে বেড়ায়। এসব আজগুবি ভাবনা আসে একা হলে। আসলে সবাই তো একাই। বিশেষত মেয়েরা। তারা ভীষণ একা হয়।

নিজের কথা ভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রান্নাঘরে। রান্নার ঝাঁজ ওঠে, গন্ধেই বুঝে নেওয়া যায় রান্নাটি স্বাদের হচ্ছে কি না। খুব ভাল মনোযোগী রাঁধুনে কন্যেরা কিন্তু বাইরের আকাশটুকুও দেখে না। মন দিয়ে খুন্তিই নেড়ে যায়। আর যারা একটু-আধটু অবাধ্য হয়ে উঠতে চায়, মনে করে, কেন এই 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা'... এই কি জীবন! তারা কিন্তু রান্নায় দু'বার নুন দিয়ে ফেলতে পারে অথবা বাইরের বাতাবিলেবু গাছে সূর্যের কৌণিক আলোটা ভাল লেগে দু'-এক লাইন মাথার ভিতর কবিতা-কথা উঁকিঝুঁকি মারতেই পারে। কিন্তু হাতের কাছে খাতা-কলম তো নেই, তাহলে!... উড়ে যায় গজিয়ে ওঠা লাইন-টাইন। অনেক সময় চোখের জল আটকে রাখে কেউ কেউ।

আবার এমনও হয়, রাত গভীর হলেও স্মৃতি হাতড়ে সেই দুপুরে ভেবে রাখা লাইনগুলো ঠিক বার করে লিখেও ফেলতে পারে কেউ বা। আমি অবশ্য আজকাল সেটা বড় একটা পারছি না। হয়ত বা বয়স পঞ্চাশ ডিঙাল, তাই। আমার ছোটবেলাটা বড্ড নিংড়ে নিংড়ে দেখে নিতে ইচ্ছে করে আজকাল। এ মাটির যত অপরাধ, যত কিছু ভাল, যেভাবে পথ চলা— সব জলছবি এখন। যে মোছে না, জলধারায় অস্পষ্টও হয় না। একেবারে স্পষ্ট। দিনের আলো, রাতের নক্ষত্রের মতো। অবিকল পূর্ণিমার চাঁদ যেমন।

আসলে একটু একা কাজ করা আমার স্বভাব। কেউ কেউ স্বার্থপর বলতে পারেন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। কোচবিহারের বাড়ি ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছি বলে অনেক মধ্যবয়সি পুরনো বন্ধু (অবশ্যই মহিলা) কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, কী রে, সব ঠিকঠাক তো?... এইরকম আলাদা আলাদা!... এতদিন পর... ব্যাপার কী? একটু অবাক, একটু ভ্রুকুঞ্চন, আর একটুখানি হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিই, 'ভালোই আছি।'

ওদিকে আমার ভালমানুষ বরটি যখন বাজার করেন, তখন পাশাপাশি বাজার করতে থাকা আমার জলপাইগুড়ির প্রতিবেশী বউদি কটাক্ষ করে বলেন, এত বাজার করছেন... কী ব্যাপার, রান্না করবে কে? মানে খুঁচিয়ে তোলা, তোমাকে একলা ফেলে সে তো বেশ ড্যাংডেঙিয়ে বাইরে গিয়ে ভালই আছে। মনের ভিতর হতাশ্বাস নিয়ে সে কি বাজার করা ছেড়ে দেবে! না, সে হয় না, হতে পারে না।

মানুষ একাও বাঁচতে পারে। মহিলারাই কিন্তু মহিলাদের এককভাবে রাঁধুনে হতে শেখায়। রাঁধুনে হয়েও কি কোনও ভাল কাজ, বাইরের কাজ করা যায় না? যায়। শুধু ইচ্ছেটাকে সম্বল করতে হয়। আর কোনওরকম কথার টীকাটিপ্পনী, বাক্যবাণের তির্যক জ্বালাময়ী ভাষণকে উপেক্ষার চোখে একটুখানি পাশ কাটিয়ে বেরতে পারলে বোধহয় মেয়েরাও সবটুকু পারে।

বুকের ভিতর যাদের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি, সেই ছেলেবেলারই ঢুকিয়ে দেওয়া আগুন, তারা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনন্তের দিকে হাত বাড়িয়েই থাকে। তা না হলে তো সৃষ্টি হত না। নোরা জন্মাত না, মনরোর কথা কেউ জানত না, কিংবা সিলভিয়াপ্লাথ অথবা সিমন বোভেয়া! আমাদের আশাপূর্ণা দেবী কিংবা প্রতিভা বসু! যুগ দুয়েক আগেই নারী কেটে বেরিয়ে এসেছে অনেক ঘোর, বহু কলকবজা, অনেক গরাদ।

বহু অন্ধকার জেলখানার মতো ঘর। তবু হয়ে ওঠা সৃষ্টির উল্লাস। এ আসলে আমাদের সেই এক নদী থেকে অন্য নদী, এক অরণ্য থেকে অন্য বনের দিকে অথবা ভৌগোলিক চেনা বেষ্টনীর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়া। তবেই তো সেই বিন্নি ধানের খোঁজ করা যায়! তবেই তো সেই মুসলিম মেয়ে জুবেদার হীরের নাকছাবির খোঁজ করতেই থাকি। আর খুঁজতে থাকি 'মানুষ' নামের হয়ে ওঠার অস্তিত্বকে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাইমাটাংঃ জ্যোৎস্না রাতের উপহার

এর আগেও রাইমাটাং গিয়েছি একাধিকবার। কলেজে পড়ার সময় একবার পিকনিক করতে গিয়ে ঘুরে এসেছিলাম। তারপর দু'এক দিনের ভ্রমণে আলিপুরদুয়ারের পরিচিত পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কোনওবার রাত কাটাইনি। তবে জ্যোৎস্নারাতে রাইমাটাং-এর রূপ উপভোগ করেছি বনবাংলোর বারান্দায় বসে, গায়ক বন্ধুর উদাত্ত কণ্ঠে হারিয়ে যেতে যেতে, ফিরে এসেছিলাম মধ্যরাতে চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর, আমার প্রিয় ছোট্ট বাহনের অন্ধকার স্টিয়ারিংয়ে বসে, নিস্তব্ধ পথে একটাও শব্দ না করে। সে রাতে মোহিনী রাইমাটাং আমার কাছে ছিল নিষিদ্ধ রমণীর মতো— যার নেশা বোধহয় আজও কাটেনি।

তাই তো বছর পনেরো বাদে যখন কলকাতার সহকর্মীরা সবাই দু'তিন রাতের ছোট্ট ছুটিতে রাইমাটাং যাওয়ার প্রস্তাব দিল, পুরনো ধমনীতে যেন নতুন রক্ত বইতে শুরু করল। ওদের বললাম, একমাত্র কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসের টিকিট পেলেই তবে যাব। কেন রে? আমার ঝা চকচকে ইংরেজি বলিয়ে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে বললাম, 'গন্ধ। সেবক পেরনোর পর কোচের পাদানিতে বসে জঙ্গলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যাব রে। এই গন্ধই আমার আয়ু বাড়িয়ে দেয় বছর বছর।'

হাসিমারা স্টেশনেই নেমে পড়তে হল। এখান থেকেই ঘণ্টাখানেকের যাত্রা। হুডখোলা জিপসিতে দুর্দান্ত অনুভূতি। রাইমাটাং পৌঁছে অবাক। পাহাড়ের দিকে মুখ করে অবাক করা গ্রামীণ রিসর্ট, স্থানীয় মানুষের তৈরি। তেরোখানা একইরকম ঘর। বারান্দায় ঠ্যাং তুলে বসে দিন-রাত কাটিয়ে দাও। ভিতরে কে যেন ডুগডুগি বাজিয়ে উঠল! বহুদিন পরে।

তিনটে দিন যে পরিমাণ প্রকৃতি পর্যটন করেছি, আমেরিকানরাও লজ্জা পাবে। আদমার পথে হেঁটে গেলাম অনেকটা, অচেনা গাঁয়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম, ঝোপের আড়াল থেকে ধুকপুক বুকে হাতির পাল দেখলাম, খোলা গলায় কোরাস গাইলাম, বিকেলে রক্সি টেনে দু'জন কুপোকাত, স্কচের বোতল ব্যাগেই পড়ে রইল। ফেরার দিন বুকটা হু হু করে উঠল, ছোট্টবেলায় মামার বাড়ি থেকে ফেরার সময় যেমনটি হত।

রাইমাটাং বুকিং— হান্ড্রেড মাইলস। ফোন নং ৯৮৩৬০৭৭২০২।

সৌমেন চক্রবর্তী

পঞ্চমুখী কচু দিয়ে মাংস

উপকরণ- পঞ্চমুখী কচু, মুরগির মাংস, পেয়াঁজ বাটা, রশুন বাটা, আদা বাটা, লংকা বাটা, আন্দাজমতো নুন, হলুদ, তেল।

প্রণালী- মুরগির মাংস পেঁয়াজ, রশুন, আদা, লংকার পেস্ট দিয়ে ভাল করে তেলসহ মেখে, নুন দিয়ে বসিয়ে সাধারণত যেভাবে রান্না করা হয়, তেমনিভাবে রান্না করতে হবে। অন্য একটি প্রেশার কুকারে পঞ্চমুখী কচু জলে সেদ্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাংস রান্না হয়ে গেলে কচু সেদ্ধ পুরোটা ওই মাংসের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। খানিকক্ষণ ফুটতে দিয়ে থকথকে হলে নামিয়ে নিতে হবে। পঞ্চমুখী কচু দিয়ে মুরগির মাংস তৈরি। বানিয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ এই পদটির।

দীপাঞ্জলি রায় চম্প্রমারি, আলিপুরদুয়ার

শখের বাগান

টবে লাগান গ্লোব লিলি

লিলির একটি প্রজাতির কথা আপনারা আগের একটি সংখ্যায় পেয়েছিলেন। এবার গ্লোব লিলি বা বল লিলির কথা বলছি। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে অনেকেই পাহাড়ে বেড়াতে যান। সেখানে খোঁজ নিলে মিলবে গ্লোব লিলির কন্দ। যত্ন করে নিয়ে অসুন ওই কন্দ। দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের মতো। বাড়িতে এনে টবে লাগান। মে মাসেই ছোট ফুটবলের আকারে ফুল ফুটবে। পাহাড়ে যদি না যাওয়া হয় তাহলে শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ের নার্সারিগুলিতে খোঁজ করুন। অবশ্যই লিলির কন্দ পাবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস

চিলতে বাগানে জৈবিক শসা

সারা বছর শসা বাজার থেকে কিনেই খান। কীটনাশক আর রাসায়নিক সারে ভরতি ওই শসা আমরা নিয়মিত হজম করছি। বছরের অন্য সময় একটু অসুবিধা হলেও বর্ষায় কিন্তু আপনার ছোট্ট বাগানে শসা ফলাতে পারবেন। আর তাও একদম জৈবিক পদ্ধতিতে।

বাজার থেকে বা কোনও চাষির কাছ থেকে বর্ধমান ভ্যারাইটির লোকাল শসার বীজ সংগ্রহ করুন। ভুলেও হাইব্রিড বীজ বুনবেন না। স্থানের অভাব না থাকলে মাটিতে, নয়ত বড় টব বা বস্তায় মাটি ভরুন। সঙ্গে পাতা-পচা সার এবং শুকনো গুঁড়ো গোবর সার মোট মাটির এক-চতুর্থাংশ মিশিয়ে নিন। বস্তাপিছু দু'টি চারা রাখবেন। লাগাবেন ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসে। দেড় মাস পরেই ফল আসতে শুরু করবে। লতানো গাছ, তাই চারদিকে খুঁটি পুতে তার এবং সুতোর সাহায্যে ছোট্ট মাচা তৈরি করে নিন। লোকাল শসা খুব সহনশীল হয়, তাই রোগ পোকার আক্রমণ কম। গোড়ায় একবার নিম খোল দিতে পারেন। প্রায় মাস দুয়েক নির্ভেজাল শসা পাবেন।

অমিত কুমার দে

পুতুলনাটক কর্মশালা

দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালে কোচবিহারে প্রথম নাটকের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল কোচবিহার আনন্দম কালচারাল

সেন্টার। তারপর থেকে সেই ধারা অক্ষুণ্ণ। প্রতি বছর গরমের ছুটিতে শিশু ও কিশোরদের নিয়ে তারা নাটকের প্রশিক্ষণ দেয়। মূলত আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদেরই প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত ১-৭ জুন এবং ৮-১১ জুন দু'টি পর্যায়ে তাদের কর্মশালা হয় কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ৫ থকে ১৪ বছরের ২৪ জন শিশু-কিশোরকে নিয়ে ওই নাট্যকর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন জলপাইগুড়ির তীর্থঙ্কর রায়, কোচবিহারের শঙ্কর দত্তগুপ্ত, দীপক চক্রবর্তী এবং সুকন্যা দত্তগুপ্ত। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মশালা হয় স্থানীয় নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কে, পরিবেশবিদ অরূপ গুহ এবং সর্পবিশারদ অর্ধেন্দু বণিকের তত্ত্বাবধানে। কর্মশালার শেষ দিন 'প্রজাপালিকা পুষ্পমালা' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল কলকাতার ধুমকেতু পাপেট থিয়েটারের সহযোগিতায় পুতুলনাটক কর্মশালা। পরিচালনা করেন দিলীপ মণ্ডল-সহ মোট চারজন প্রশিক্ষক। ওই কর্মশালায় দু'ধরনের পুতুলনাটক তৈরি হয়। দস্তানা বা গ্লাভস পাপেট, যা হাতে নাড়ানো হয়, তা দিয়ে 'স্বচ্ছ ভারত' নামে একটি নাটক ও ডাঙের পুতুল বা রড পাপেট দিয়ে 'এক বছরের রাজা' নামে অন্য একটি নাটক প্রস্তুত হয়। এগারো দিন ব্যাপী এই কর্মশালার শেষে সমস্ত প্রশিক্ষকসহ ডুয়ার্সের তিন কবি অমর চক্রবর্তী, শৌভিক রায় ও মাধবী দাসকে সম্মান জানানো হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে শংসাপত্র ও ছোট্ট উপহার তুলে দেওয়া হয়। আনন্দময় কালচারাল সেন্টারের সম্পাদক আশুতোষ পাল জানান, ১৯৮০ সালের ১৫ অগাস্ট তাঁদের সংস্থার জন্ম মূকাভিনয়, নৃত্যনাট্য নিয়ে। জানুয়ারি মাসে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে তাঁদের উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব হয়েছিল, তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা থেকে মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। এ বছর সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পুতুলনাটকও যুক্ত হল। শুধু ডুয়ার্স নয়, গোটা দেশের সংস্কৃতি থেকে ক্রমেই পুতুলনাচ হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এই শিল্প চোখে দেখেনি। পুতুলনাচের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এবং তাদের মধ্যে পুতুলনাটক নিয়ে আগ্রহ তৈরি করার জন্য আনন্দম কালচারাল সেন্টারের এই প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হল রোটারি ক্লাব কক্ষে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন দুর্গা ভট্টাচার্য, বিভাস ব্যানার্জি, দেবলীনা বসু। আবৃত্তিতে অংশ নেন ইন্দ্রাক্ষী শর্মা বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ বিশ্বাস। নৃত্যে রেশমি চক্রবর্তী, সুপর্ণা মণ্ডল, সাগ্নিকা চ্যাটার্জি প্রমুখ। এ ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন প্রদীপ দে ও শুভাংশু ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অম্বরীষ ঘোষ।

লৌকিক-এর নজরুল স্মরণ

অলিপুরদুয়ারের লোক সাংস্কৃতিক সংস্থা লৌকিক আয়োজিত নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল সম্প্রতি। শহরের মাধব মোড় সংলগ্ন নজরুলমূর্তিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। মাল্যদান করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অর্ণব সেন, প্রতীক ব্যানার্জি, লৌকিক-এর আহ্বায়ক প্রমোদ নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে অংশ নেন ঊর্মি রায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য, ভাস্কর চৌধুরী, ইন্দ্রাক্ষী মুখার্জি, পাপিয়া সরকার প্রমুখ। এ ছাড়া অসংখ্য খুদে শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অম্বরীষ ঘোষ।

আবৃত্তি কর্মশালা

আগামী ২৬ জুন আলিপুরদুয়ারে 'আবৃত্তি নীড়' আয়োজন করতে চলেছে একদিনের আবৃত্তি কর্মশালা। পৃষ্ঠপোষকতায় ডিরোজিও কোচিং ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। কর্মশালায় উপস্থিতি থাকবেন চন্দ্রমৌলী বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিতোষ সাহা

নাট্যসন্ধ্যা

আরও একটা নাট্যসন্ধ্যা বেশ জমজমাটভাবে সাঙ্গ হল জলপাইগুড়ি শহরে। বাদল সরকারের যুগান্তকারী নাটক 'বিংশ শতাব্দী' গত ১২ জুন রবিবার জলপাইগুড়ি সরজেন্দ্র দেব কলাভবনে (আর্ট গ্যালারি) মঞ্চস্থ হয়ে গেল। 'উদীচী নাট্য সংস্থা'র বিংশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই নাটক মঞ্চস্থ হল। নাট্য নির্দেশক অভিজিৎ নাগ জানান, 'এই প্রযোজনা নিয়ে আমরা সর্বভারতীয় স্তরের নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে লখনউ যাব এ বছরেরেই ডিসেম্বরে।' নাটক দেখতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই ইতিহাসনির্ভর নাটক সকলকেই মুগ্ধ করেছে নিজ নাট্যশৈলী ও অভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয়ে যুক্ত প্রচুর কলাকুশলী ছিলেন জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত।

'অবতামসী'র পুনঃপ্রকাশ

গত ১২ জুন রবিবার জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে পুনরায় প্রকাশিত হল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান অথচ প্রচারবিমুখ লেখক সুরজিৎ বসুর প্রথম উপন্যাস 'অবতামসী'। পুনরায় প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল 'তিতাস'। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক তথা 'কথাসোপান' পত্রিকার সম্পাদক অমর মিত্র। জলপাইগুড়ি শহর থেকে সুরজিৎ বসুর প্রচুর ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা বাংলা সাহিত্যের আগ্রহী পাঠকের নজর কেড়েছিল। বিশেষজ্ঞের মতে, 'অবতামসী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'না-উপন্যাস'। সে দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. বিমলেন্দু মজুমদার, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় দে, বিপুল দাস। সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন 'দ্যোতনা' পত্রিকার গৌতম গুহ রায় ও 'মল্লার' পত্রিকার শুভময় সরকার।

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

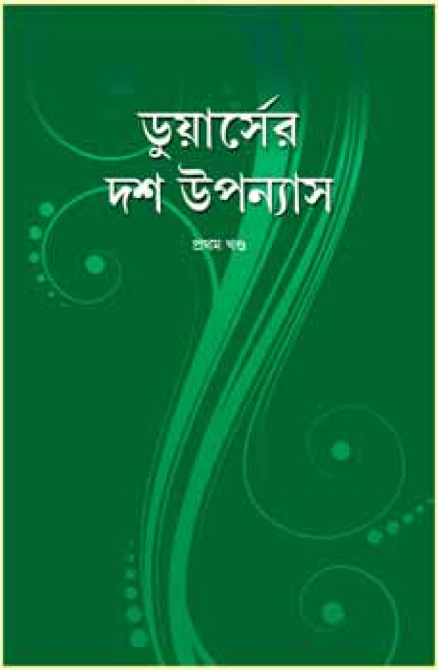

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য **২৫০ টাকা**।

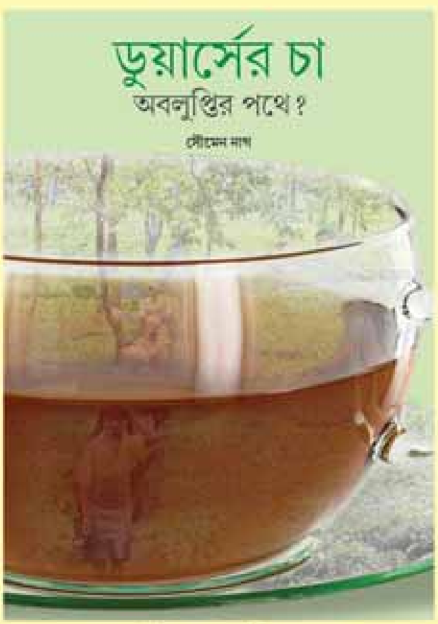

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য **১৫০ টাকা**।

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য **১৫০ টাকা**

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য **১৫০ টাকা**

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য **২০০ টাকা**

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য **১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা**

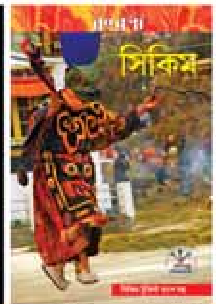

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ। মূল্য **২০০ টাকা**

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য **২০০ টাকা**

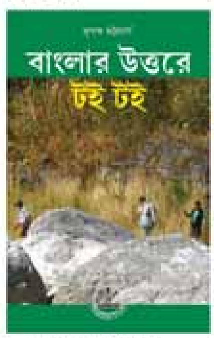

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য **১০০ টাকা**।

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য **১২০ টাকা**

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য **১৫০ টাকা**

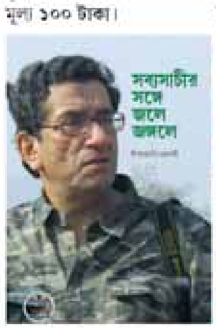

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য **১৫০ টাকা**

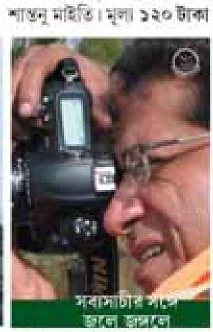

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য **১৫০ টাকা**

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য **১০০ টাকা**

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-3/1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ABACUS & Brain Gym

A Brain Development Training for your Child

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হবে ঃ

- অংকে পারদর্শিতা
- মনোযোগ
- স্মরণশক্তি
- আত্মবিশ্বাস
- কল্পনাশক্তি
- আত্মনির্ভরশীলতা
- উপস্থিত বুদ্ধি
- উপস্থাপনা
- মেধা ও প্রতিভা
- গতি ও নির্ভুলতা

Age 4 to 13 yrs

vedic maths

Age 12+

Vedic Mathematics

an ancient system for fast & easy calculation

বৈদিক যুগের কিছু কৌশল যা অংককে আরও তাড়াতাড়ি সমাধান করতে সাহায্য করে।

Your Child can solve these mentally?

2679502/43 in 12 secs

1412 × 14 in 5 secs

18% of 120 in 4 secs

$(965)^2$ in 5 secs

$\sqrt[3]{11852352}$ in 20 secs

Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Percentage, L.C.M, H.C.F, Square & Cube Roots All In 30 Seconds.

SCA STAR CAREER ACADEMY

Call: 03561-220244
9933021080
8768886366

ENGLISH LEARNING PROGRAM FOR ALL AGE GROUP

SpeakWell

Enabling You to Speak English Confidently & Fluently

Reading · Writting · Listening · Speaking

Starter

COURSE BENEFITS: AGE 2.5 to 7

- ✓ PHONICS & READING.
- ✓ GRAMMAR & SENTENCES.
- ✓ SPELLING & VOCABULARY.
- ✓ SPEAK FLUENTLY.
- ✓ CONVERSATION SKILLS.
- ✓ WRITING & TYPING.
- ✓ BECOME AN INDEPENDENT READER.

Basic	Junior	Fluent
Age 8 to 13	Age 14 to 18	Age 18+

-: COURSE BENEFITS :-

- Practice of phonetic transcription.
- Each level includes improvement of grammar, vocabulary, pronunciation.
- Writing paragraph, essay, letter, application, story etc.
- Reading from the contemporary novels, plays and newspaper.
- One to one dialogue, question-answer session, group discussion, public speaking and real life dialogues.
- Increase fluency and improve pronunciation.
- Communicate clearly, confidently & effectively through conversation skills.

SpellWell

Age 6 to 12

Spelling & Vocabulary Building Course for kids

Course Goals: Duration: 30 Hrs

- *Review Basic Spelling Rules.*
- *Learn spelling strategies and tips.*
- *Become familiar with Common Homonyms.*
- *To understand spelling dilemmas such as 'ie' vs. 'ei'.*
- *Become familiar with frequently Misspelled Words.*

WriteWell

Age 6 to 12

A Handwriting Improvement Course for Kids

Course Goals: Duration: 30 Hrs

- *Improves clear & legible writing.*
- *Develops gross and fine motor skills.*
- *Can able to write in print, cursive & italic style.*
- *Increases patience & enhances confidence.*
- *Improves image and personality.*
- *Generates interest in neat writing even while writing speedily.*

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.